মিছিল

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

দাম দেড় টাকা।

হঠাৎ কখন তন্দ্রা আসে।

আধো ঘুম আধো জাগরণের ভিতর মনে হয় নীচে যেন সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে।

চমকিয়া জাগিয়া উঠি।—সমুদ্র গর্জ্জনই বটে,—ভাষার সমুদ্র!

পৃথিবীর বিচিত্র বিপুল জীবনলীলার প্রতিমুহূর্ত্তের কাহিনী কল-কল্লোলে কাগজের উপর কালো আখরে ফেনাইয়া উঠিতেছে।

ভিজে 'গেলি'টা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া অবিনাশ বলে, "দিন একটু তাড়াতাড়ি সেরে দিন। আর্টিকেলটার জন্যে ফর্ম্মা আটক রয়েছে।"

শচীন কোণ্ হইতে ধমক দিয়া বলে, "আট্‌কে রয়েছে ত থাকুক। ফর্ম্মা তোমার সব কিছুর জন্যেই আট্‌কে থাকে! একে ত ওই কাগজ, তায় ভিজে, কলম ত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ছিঁড়ে যায়। ওতে তাড়াতাড়ি প্রুফ্ করেক্‌শন্ হবে কি করে শুনি?"

সুরে সুর মিলাইয়া কাশীনাথ বলে, "প্রুফের কাগজ বদলাতে বোলো, বুঝেছ? নইলে তাড়াতাড়ি আমরা পারব না।"

ছাপার কালীমাখা হাত দুইটা হতাশার ভঙ্গিতে চিৎ করিয়া দিয়া অবিনাশ বলে, "আমি কি করব বলুন, আমার কি হাত?"

"হাত নেই ত চুপ করে থাক, মাথার কাছে টিক্‌টিক্ কোরোনা।" বলিয়া কাশীনাথ ভিজে গেলিটা টানিয়া লয়।

মিছিল

ধমক খাইয়া ব্যথিত হইয়া একমাত্র আমাকেই বোধ হয় দরদী মনে করিয়া অবিনাশ তাহার দুঃখের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করে।

"আমাকে ধমকালে কি হবে বলুন, আমি কি সাধ করে তাড়া-হুড়ো করি! কাল 'ষ্টিরিও' ভেঙ্গে গিয়ে দেরী হয়ে কাগজ ডাক ফেল করলে আর আমাদের হয়ে গেল দু'টাকা করে জরিমানা! পুরোনো মান্ধাতার আমলের মেশিন, ওত বিগড়েই আছে। কিন্তু সব দোষ হবে আমাদের। তাই না জরিমানার ভয়ে তাড়াতাড়ি সারতে চাই!"

অবিনাশ আমাদের প্রিণ্টার। কাগজের উপরে ছাপার অক্ষরে তাহার নাম নিত্য সম্পাদকের নামের পাশে শোভা পায়। কাগজের দোষ ত্রুটি ঘটিলে আদালতে কাঠগড়ায় গিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। দরকার হইলে বুঝি জেলেও যাইতে হয়। কিন্তু দুঃখ সেজন্য তাহার নাই।

দড়ির মত পাকানো চেহারা। গোফদাড়ি-কামানো শুকনো মুখ দেখিয়া বয়স তাহার আন্দাজ করা কঠিন। নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যায় আসিয়া বয়স আর তাহার যেন বাড়িতে চাহে নাই।

লুকাইয়া নেশাটা আশ্‌টা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে অম্লান বদনে উত্তর দেয়, "রোজ রোজ রাত জাগা কি নইলে সয়।"

নেশার দরুণ বা অন্য যে কারণেই হোক রাতের পর রাত সে যে জাগিতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ কাহারও নাই। আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এমনি নাকি সে রাত জাগিয়া আসিতেছে। সুবিধা পাইলে ও হাঁপ ছাড়িবার সময় থাকিলে সে-কথা শুনাইতে সে ছাড়ে না। বড়াই করিয়া বলে, "আজই না হয় এলাহি কাণ্ড চলেছে—তিনটে রোটারী, তিনশ' লোক দেখছেন! কিন্তু যখন একখানা ঘরে হ্যাণ্ড্‌প্রেসে কাগজ

বেরুত তখন রাতের পর রাত একলা সমস্ত কাগজ বার করেছে এই অবিনাশ।”

অপরূপ ভঙ্গিতে নিজের হাড়-বাহির-করা বুকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিয়া যায়, “বললে বিশ্বাস করবেন না এক একদিন রামবাবুর লেখার ফুরসৎ থাকতনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে বলে যেতেন আর অমনি শুনে শুনে কম্পোজ করে যেতুম।” তাহার পর অসংলগ্ন ভাবে মন্তব্য করে ‘তেমন এডিটার আর হবে! এরা কি লিখতে জানে নাকি!’

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ‘নির্ভীক’ যখন কলিকাতায় এক অধুনাবিলুপ্ত গলির বর্ত্তমানে-চিহ্নহীন ভাঙ্গা পুরাতন একটি বাড়ীর একটিমাত্র ঘরে সেকেলে একটি হ্যাণ্ড প্রেসের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহাকে লালন ও পালন করিয়াছিল মাত্র দুটি লোক—সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রামবাবু এবং প্রিণ্টার আমাদের অবিনাশ। তাহার পর ‘নির্ভীক’ বলিতে গেলে দ্বিতীয়ার শশিকলার মতই দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছে—দুই পাতার কাগজ ষোলপাতা হইয়াছে, হ্যাণ্ড প্রেসের জায়গায় তিন তিনটা রোটারীতে পর্য্যন্ত কুলায় না। বাঙ্গলার সুদূরতম দুর্গম পল্লীতে পর্য্যন্ত ‘নির্ভীকের’ নির্ভয় বাণী নিত্য পৌঁছায়। রাতের পর রাত ফিরিয়া দিনের পর দিন ঐশ্বর্য্য প্রভাব প্রতিপত্তি তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে।

‘নির্ভীকের’ জয়যাত্রার পাশে এতদিন ধরিয়া সঙ্গী হইয়াছে একমাত্র ওই অবিনাশ।

জরিমানার কথাটা কিন্তু তাহার মিথ্যা। বলি “ওটা তোমার মিথ্যে কথা অবিনাশ। তোমায় কি ওরা জরিমানা করতে পারে!”

তৎক্ষণাৎ অবিনাশের সুর বদলাইয়া যায়। শীর্ণমুখে একগাল হাসিয়া বলে, “যা বলেছেন। তা হলে কি আর ধর্ম্মে সইবে! বলে—”

কিন্তু কথা তাহার শেষ করিবার সময় মেলে না।

আর্টিক্লের প্রুফ্‌টা সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কাশীনাথ বলে, "আচ্ছা আর বলতে হবে না, ওই নাও। আর একশগণ্ডা রংফাউন্ট, —ওসব কি আমরা শোধরাব!"

অবিনাশ উত্তর দেয় না। প্রুফ্‌টা লইয়া সবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়। টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারে মাথা হেলান দিয়া কাশী কোন রকমে একটু ঘুমাইয়া লইবার আয়োজন করে।

নীচের প্রেস হইতে রাত্রির স্তব্ধতা মথিত করিয়া রোটারী মেশিনের অবিশ্রাম শব্দ উঠিতে থাকে। ঘুমের ভিতর যাহা সমুদ্রগর্জ্জন বলিয়া মনে হইতেছিল এখন তাহা ভিন্ন রকম শোনায়।

কালীর আখরে চিরকালের মত স্তব্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে ও যেন শব্দময়ী ভাষার শেষ আর্ত্তনাদ।

সকালে আবার ভিন্নরূপ।

অতৃপ্ত নিদ্রা লইয়া ক্যাম্পখাট হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না। নীরবে শুইয়া শুইয়াই সমস্ত শুনিতে পাই।

পাশের ঘরে গতরাত্রির কাগজের জঞ্জাল ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়া স্তূপাকার করিতে থাকে। নীচে রোটারী মেসিন তখনও থামে নাই। কিন্তু ঠিকাদারের হট্টগোল, সাইক্ল পিয়নদের কোলাহল তাহাকেও ছাপাইয়া উঠে।

অনেকক্ষণ পরে বিছানা হইতে উঠিয়া যখন নামিয়া যাই, তখন আফিসে

দরজাতে কাগজ-ফেরিওয়ালাদের ভীড় অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে। পিঠে পোষ্টার-মারা-বোর্ড বাঁধিয়া বোধ হয় শেষ পিয়ন আমার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। বড় বড় রীল কাগজের বাণ্ডিল-ভর্ত্তি পিপেগুলি গরুর গাড়ী হইতে নামান চলিতে থাকে। সঙ্কীর্ণ বাহিরে যাইবার পথে বৃহদাকার পিপেগুলিকে পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে দেওয়ালে আঁটা পোষ্টারের রক্তবরণ ঘোষণা চোখে পড়ে—'ভারতে যুবক জাগরণ।'

রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এ ঘোষণা পড়িয়া ম্লান একটু হাসি মুখে আসে। অথচ একদিন ইহাতেই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। চোখের উপর সেদিন যেন দেখিতে পাইয়াছি এই অগ্নিবরণ ঘোষণা বাঙ্গলার প্রান্ত হইতে প্রান্তে 'নির্ভীক' বহিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলার যৌবনের কানে বৃহত্তর জীবনের ডাক পৌছাইয়া দেবার এই যে মহান্ প্রচেষ্টা ইহাতে যত নগণ্যই হোক একটু হাত আমারও আছে, এ কথা মনে করিয়া গর্ব্বও বুঝি একটু সেদিন অনুভব করিয়াছি।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গ্রামের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর দেশসেবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঘরে বসিয়া চরকা কাটিয়াছি, নিজের হাতে বোনা এক কাপড়ে থাকিয়া দুঃসহ শীতের দিনে দেশের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছি ভাবিয়াছি, পল্লী-সংগঠনের উৎসাহে গভীর রাত্রে দল বাঁধিয়া পরের বাগানে বাঁশঝাড় কাটিতে গিয়া ও পরের ডোবায় কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিয়া মার ও ভর্ৎসনাও যে খাই নাই তাহা নয়।

তারপর অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে ভাসিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম জেলে যাইতে। জেলেই শচীনের সঙ্গে আলাপ।

মিছিল

লম্বা একটা ঘরের ভিতরে জন পঁচিশ শুইতাম।

ভোরের বেলা একদিন ঘুম ভাঙিতেই শুনি ঘরের ভিতর হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমার পাশের বিছানায় যে ছেলেটি শুইত সে শশব্যস্ত হইয়া আমার গা ঠেলিয়া বলিল, "আরে উঠুন মশাই! কে আবার গলায় দড়ি দিয়েছে।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেখি সত্যই সুউচ্চ জানলার গরাদে হইতে লম্বমান একটা কাপড়ের ফাঁস গলায় অটকাইয়া একজন ঝুলিতেছে। এবং তাহার চারিদিকে ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

দূর হইতে দেখিলে মুখ তাহার অত্যন্ত বীভৎস বলিয়াই মনে হয়। জিভ খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নিমীলিত চোখের কোলে কালী।

ছুঁইতে কেহ সাহস করে না। পাগলা-ঘন্টি তখনও দেওয়া হয় নাই। জেলারকে খবর দিয়া ওয়ার্ডার সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় হতভম্ব হইয়া ভযে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

কে একজন বলিল, "মরে গেছে অনেকক্ষণ।"

ওয়ার্ডারকে বলিলাম, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নামিয়ে ফেলতে পার না?"—সে সাহস তাহার নাই দেখিয়া নিজেই নামাইতে গেলাম। চোখের উপর ওই বীভৎস দৃশ্য কতক্ষণ ধরিয়া দেখা যায়!

লোহার খাটটার উপর দাঁড়াইয়া তাহার গলার ফাঁস খুলিতে যাইতেছি, হঠাৎ তাহার গায়ে হাত ঠেকিতে চমকিয়া উঠিলাম। গায়ের উত্তাপ তাহার স্বাভাবিক দেহের মত! সন্দিগ্ধ হইয়া বুকে কান পাতিয়া দেখি হৃদ্‌পিণ্ড তাহার বুকের ভিতর সোৎসাহে নৃত্য করিতেছে।

বিস্মিত হইয়া সকলকে একথা জানাইব কি না ভাবিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ গালে এক চড়।

নিজেই ফাঁস হইতে মাথাটা গলাইয়া বাহির করিয়া খাটের উপর ছেলেটি নামিয়া পড়িল। কি কৌশলে গলায় সে অমন ফাঁস লাগাইয়াছিল, সেই জানে! নামিয়াই সে বলিল—"কোথাকার গাধা এটা? দিলে সব মজাটা মাটি করে। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে কি নাচানটাই নাচান যেত।"

চারিদিকে তখন হাসির রোল পড়িয়া গিয়াছে। শুধু ওয়ার্ডার বেচারী সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে কি কৈফিয়ৎ দিবে বোধ হয় ভাবিয়া না পাইয়া কাতর ভাবে সকলের দিকে চাহিতেছে।

ল্যাম্পের কালী চোখের কোল হইতে কাপড়ে মুছিতে মুছিতে আত্মঘাতী ছেলেটি আমাকে আবার সহাস্যে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কি দরকার ছিল তোর মোড়লী করে নামাতে যাবার বল ত?"

এই শচীন!—ওযার্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করিবার এমন ফন্দি সে নিত্য একটি করিযা আবিষ্কার করিত। জানিতও সে অনেক কিছু; গান বাজনা, ম্যাজিক জিমনাষ্টিক ইত্যাদি করিযা সারাদিনরাত্রি সে একাই সমস্ত ওযার্ড মাতাইযা রাখিত।

এত বেশী প্রাণের প্রাচুর্য্য ইহার পূর্ব্বে আর কাহারও ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

পরিচয় তাহার সহিত গভীর হইল জেলের বাহিরে আসিয়া। একই দিনে আমরা দুইজনে মুক্তি পাইয়াছিলাম।

ঠিকানা একটা অবশ্য ছিল কিন্তু জেল হইতে ফিরিয়া সরকারী চাকুরে-দের বাড়ীতে সাদর অভ্যর্থনা যে পাইব না তাহা জানিতাম। আমাকে

ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল। বলিল, "চ আমার ওখানে।"

তাহার 'ওখান' সম্বন্ধে কোন কথা না জানিয়াই তাহার সহিত রওনা হইলাম।

কলিকাতার এক প্রান্তে দরিদ্র পল্লীর ভিতর ধ্বংসোন্মুখ একটি মেটে বাড়ীর চেহারা দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় একটা আস্তানা থাকিলেও শচীনের অবস্থা আমার অপেক্ষা বিশেষ ভালো নয়।

পরে জানিয়াছিলাম বাড়িটিও তাহার নিজেদের নয়—একটা ঘরে সে ভাড়া দিয়ে থাকে মাত্র।

দরজার কড়া নাড়িতেই একটি বছর আঠার-উনিশের মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

শচীন বক্তৃতার সুরে বলিল, "দেখলি ত ব্যাপার? এতে আর স্বদেশ-সেবা করতে ইচ্ছে করে! কোথায় জেল থেকে বেরুতে না বেরুতেই রোল উঠবে—"জাগ জাগ পুরনারী, জিনিয়া সমর আসিছে অমর বীরকুল তোমারি," তার বদলে রাস্তায় ত একটা লোক ডেকেও শুধোল না। বাড়ীতে ঢুকতে একটি মাত্র পুরনারী চোখে পড়ল, তিনিও চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সরে পড়লেন। নে, আয় তুই।"

মেয়েটি তাহার কোনও আত্মীয়া হইবে ভাবিয়া তাহার কথায় হাসি পাইয়াছিল।

কিন্তু তাহার ঘরে গিয়া বসিবার পর তাহার কথায় অত্যন্ত বিস্মিত ও

বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। ঘরের একধারে গুটানো একটা ছিন্ন মাদুর সে পাতিতেছিল।

যে মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল সেই বোধ হয় দরজার সম্মুখ দিয়া ত্রস্ত পদে পার হইয়া গেল।

হঠাৎ আমার দুই চোখে হাত চাপা দিয়া শচীন বলিল, "এই গাধা, ও দিকে চাইছিস্ যে বড়! ঘরে আশ্রয় দিলাম, আবার আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা! দোহাই ভাই, দুটি বছর সাধনা করে সিদ্ধির কূল ধরি ধরি হয়েছে। এখন যদি সব ভেস্তে দাও ত ভাল হবে না বলে রাখছি।"

তারপর আমার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত করিয়া সে বলিয়াছিল, "ওই যা, তোরা যে এক একটি খড়্গপৃজ তা ভুলেই গেছলাম।"

ভাবিয়াছিলাম, সেই দিনই তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু পারি নাই।

শুধু যে যাইবার জায়গা কোথাও ছিল না তাহা নয়—শচীনকে ছাড়িয়া যাওয়াও কঠিন।

শচীনের অনেক দোষ।

এক এক সময়ে মনে হয়, জীবনের কোন আদর্শেরই মূল্য বুঝি তাহার কাছে নাই। মাঝে মাঝে তাহার লঘু তরলতায় পীড়িত হইয়া উঠি। তবু তাহাকে কেমন যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

তাহার আশ্রয়েই দিন কাটিতেছিল। প্রথম কয়েকদিন বুঝিতে পারি নাই—তাহার পরে বুঝিলাম, আর একজনের ভার লওয়া দূরের কথা, নিজের খরচ চালাইবার মত সংস্থানও তাহার নাই।

লজ্জিত হইয়া একদিন দেশে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম।

শচীন খানিক গম্ভীর হইয়া রহিল, তাহার পর হাসিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মনু—"।

মনু নিকটেই কোথায় ছিল, আসিয়া দাঁড়াইতেই গম্ভীর ভাবে ভৎর্সনা করিয়া শচীন বলিল, "তুমি রবীনকে পেটভরে খেতে দাও না শুনলাম, বড় অন্যায় কথা! পাড়াগাঁয়ের ছেলে দেশ-উদ্ধারই না হয় করতে এসেছে তা বলে উপোস করে ত আর থাকতে পারে না। ও-ত রেগে মেগে দেশেই চল্ল।"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "বাঃ, আমি সেই জন্যেই দেশে যেতে চাচ্ছি বুঝি?"

কয়েকদিন ধরিয়া মনু অসঙ্কোচে আমার সম্মুখে বাহির হইতেছিল। এই কয়দিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম, দুষ্টামিতে এই চঞ্চল মেয়েটি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হাসিয়া সে বলিল, "না খেতে পেয়েই ত ওই দত্যির মত চেহারা—দেখলে ভয় করে! পেট ভরে খেতে দিলে আর রক্ষা থাকবে!"

মনু চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া ফিরাইয়া শচীন বলিল, "দেখ মনু, রবীন জোয়ান মানি, কিন্তু তুমি বরাবর ওর চেহারার ওরকম প্রশংসা আমার সামনে কোরোনা। আমার ঈর্ষা হয় তা জান!"

"হোক্" বলিয়া মনু চলিয়া গেল।

শচীনকে চিনিতাম। কথাটা সে যে এমনি করিয়া চাপা দিল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন সে আর চালাইবে ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত না হইয়াও থাকিতে পারিলাম না।

আর তাহার নিজের কিছুই নাই। সে নিজে বহুদিনের পরিচয়ের সূত্রে বা যে কারণেই হউক এই দরিদ্র পরিবারের উপর ভর করিয়া থাকিতে হয় ত পারে; কিন্তু ইহার উপর অকারণে আর এক বন্ধুর ভার তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া তাহার কখনই উচিত নয়। সে কথা তাহাকে বলিতে যাওয়া অবশ্য বৃথা। একদিন জোর করিয়া বলিয়াছিলাম। সে পরিহাস করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "মানুষকে অত ঘেন্না করিস কেন বল্‌ত! আমরাই সকলের উপকার করব, আমাদের উপকার করবার সুবিধে কাউকে দেব না—এত বড় অহঙ্কার!"

কিন্তু উপকার করিবার সুবিধা দেওয়া আমার পক্ষে এবার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। একটি মাত্র লোকের রোজগারে মনুদের সংসার কোন রকমে চলে। কোন মোটরের কারখানার মোটরমিস্ত্রীর কাজ করিয়া মনুর বড় ভাই যাহা রোজগার করিয়া আনে, বিধবা মাতা ও ভগ্নীর ভরণ-পোষণের পক্ষেই তাহা যথেষ্ট নয়। তাহার উপর এই দুটি অতিরিক্ত

লোকের বোঝায় সংসার তাহাদের প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিতেছিলাম।

তাহাদের দিক হইতে বিরক্তি বা অসন্তোষের কোন লক্ষণ অবশ্য দেখি নাই। এই কয়দিনের ব্যবহারে বুঝিয়াছিলাম এই সমস্ত পরিবারটিরই নিকট শচীন দেবতা বিশেষ।

কাজ শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতে অক্ষয়ের রাত হইত! দেখা তাহার বড় পাইতাম না। শচীনের সঙ্গে যে দু'একবার তাহাকে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম তাহাতেই বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। মানুষ যে মানুষকে অত শ্রদ্ধা করিতে পারে ইহার পূর্ব্বে কোনদিন কল্পনা করিতে পারি নাই।

শচীনের পক্ষে এ শ্রদ্ধা গ্রহণ করা হয় ত অন্যায নয় মানিলেও এ শ্রদ্ধা ভাঙ্গাইয়া দিন যাপন করিতে মন আমার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

আমার দেশে যাইবার কথা চাপা দিযা নিশ্চিন্ত মনে শচীন বিছানায শুইয়া পড়িয়া কি একটা বই পড়িতেছিল।

বইটা টানিয়া লইযা বলিলাম, "দোহাই তোমার; খানিকক্ষণের জন্যে হাসিঠাট্টা রেখে আমার একটা কথা শুনবে?"

আমার দিকে একবার চাহিযা কি ভাবিয়া উদ্যত হাসি দমন করিয়া সে বলিল, "কি বল্ না?"

"এই রকম কুড়ের মত দিনের পর দিন কাটাতে তোমার ভাল লাগে?"

"এত গেল ভূমিকা, তারপর—"

"তারপর এখানেই যদি রইলাম, তাহলে কোন রকমে কিছু রোজগারের চেষ্টা করা যায না? তুমি না কর আমি করতে পারি না?"

মিছিল

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত উঠিয়া বসিয়া শচীন বলিল, "ঠিক বলেছিস্, রোজগার কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে। বীরের এ বসুন্ধরা—অলস কুড়ে পরগাছাদের এখানে স্থান নেই। দেহের ঘামে পৃথিবীর মাটি যারা সরস উর্ব্বর করে তুলেছে, নখর দিয়ে পৃথিবী বিদারণ করে খনির গুপ্তধন যারা ছিনিয়ে আনছে, আমরা তাদের দলে। পরগাছা আমরা নই, যে হাত আমরা মুখে তুলি সে হাতময় কঠিন কাজের কড়া পড়েছে।—মনু!"

বিরক্তির মধ্যেও বক্তৃতার শেষে তাহার মনু ডাকে হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "আবার মনুকে দরকার হ'ল কেন?"

"বাঃ ওদেরই ত দরকার আগে! পৃথিবীর সকল কর্ম্মের ওরাই প্রেরণা—ওরা শক্তি!"

"বক্তৃতাটা শুনেছি, এখন কিসের শক্তি প্রয়োজন শুনি?" মনু দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"শুনতে পেয়েছ তা জানি। এখান থেকে দেখতে পেয়েই বক্তৃতাটা দিয়েছি। আচ্ছা, তোমার সেই বালাগাছাটা এখনও আছে না গেছে? মাস কয়েক আগে মনে হচ্ছে একবার নিয়েছিলাম। ফিরিয়ে দিয়েছি কিনা মনে নেই।"

"ফিরিয়েই দিয়েছ। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।" বলিয়া মনু চলিয়া গেল।

সত্যই রাগ হইয়াছিল। বলিলাম, "তুমি কি একেবারে নির্লজ্জ শচীন? এদের ওপর এত অত্যাচার করেও তোমার হয় নি! কোন্ মুখে মনুর বালাটা তুমি চাইলে?"

"পরম সহাস্য-সুন্দর-মুখে। চেয়েই দেখ্ না।" খানিক চুপ করিয়া

থাকিয়া আবার সে বলিল, "আহা, চটিস্ কেন ভাই! কি করি আগে, তাই দেখ্ না।"

মন্থু বালাটা আনিয়া দিবার পর আমাকে লইয়া শচীন বাহির হইয়া পড়িল।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে তাহার সঙ্গে যাইতেছিলাম। পথে কাগজে-মোড়া বালাটা একবার বাহির করিয়া সে বলিল, "ভাগ্যিস্ তুই রোজ-গারের কথা বল্লি, নইলে আমার খেয়ালই হত না।"

"খেয়াল ত খুব হয়েছে, চলেছ একটা অসহায় মেয়ের গয়না বেচতে!"

শচীন একটু হাসিল, তারপর আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "মোট বইতে পারবি? খবরের কাগজের বোঝা নিয়ে ফিরি করে বেড়াতে লজ্জা করবে না ত?"

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "ওরে পাগ্লা, রোজগার করতে হ'লেও যে টাকার দরকার! এই বালার টাকা কাগজের অফিসে জমা দিয়ে রোজ দু'জনে কাগজ বিক্রি করব। দু'মাসে বালা ত বালা, মন্থুর সোনার হার গড়িয়ে শোধ দেব'খন। বুঝলি!"

বুঝিয়াও একেবারে প্রসন্ন হইতে পারিলাম না।

তাহার সঙ্গে সহরের অপর প্রান্তে এক স্যাক্‌রার দোকানে যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বলিলাম, "এতখানি পথের মধ্যে আর স্যাকরার দোকান ছিল না?"

কথার উত্তর না দিয়া সে দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু এত দূরে আসিয়াও দাম লইয়া বনিবনাও কিছুতেই হইল না। স্যাকরা যাহা দিতে চাহিয়াছিল, তাহা নাকি অত্যন্ত অল্প। বালাটি আবার কাগজে মুড়িয়া লইয়া সে উঠিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া

মোড়কটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দিন, যা আপনাদের ধর্ম্মে হয়। অনেক হেঁটেছি আর ঘোরাঘুরি করতে পারি না।"

স্যাকরা বুঝি সত্যই দাঁও মারিয়াছিল। পাছে আবার মত বদলায় সেই ভয়েই বোধ হয় তাড়াতাড়ি সে টাকাটা বাহির করিয়া দিল।

পথে আসিতে আসিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত দূরে ভালো দামের জন্যে এসে অত কমে রাজী হলে কেন?"

"কি করব, আর ঘুরতে ভাল লাগল না।" বলিযা সে হাসিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু তার হাসির অর্থ বুঝিযা বিস্ময়ে ঘৃণায় বিরক্তিতে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

মনুকে ডাকিযা শচীন বলিল, "টাকাগুলো আজ তুলে রাখ ত' মনু— কাল থেকে এই টাকায রোজগার সুরু হবে। আর তোমার বালাটা আজ আর দরকার লাগল না, এটাও তুলে রাখ।"

কাগজের মোড়ক খুলিযা বালাটা সে মনুর হাতে তুলিযা দিল।

মনু চলিযা যাইবা মাত্র আমার মুখের ভাব দেখিযা তাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া সে বলিল, "অবাক্ হযে গেছিস্ না রে রবি? ম্যাজিক রে ম্যাজিক, হাতের কসরৎ কি মিছামিছি শিখেছিলাম!"

"অবাক্ তোমার ম্যাজিক দেখে হইনি শচীন, কিন্তু সে কথার আর দরকার নেই। কাল থেকে আমি আর এখানে থাকব না।" বেদনায় গলার স্বর বুঝি সত্যই ভারী হইয়া আসিয়াছিল।

আমার কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিক

তাকাইয়া থাকিয়া সে আবার হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর কৃত্রিম দুঃখের স্বরে বলিল, "তোরা সব কার্ল মার্কস্, বাকুনিন, লেনিন পড়িস, মুখে রাশিয়ার মত পৃথিবীতে সকলকে সব-ধন সমান ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে সব সমতল করে দেওয়া উচিত বলিস্। আর আমি সোজা মানুষ, তাই শুনে হাতে-নাতে স্যাকরা বেচারার টাকার পাহাড়ের চুড়োর ডগাটুকু যেই খসিয়েছি অমনি গেলি চটে! লেনিনের দল না হয় মেরে ধরে খুন করে কাজ হাঁসিল করেছে; আমার বেলা কি শুধু হাত সাফাই বলেই দোষের হ'য়ে গেল?"

এ সময়ে তাহার ভাঁড়ামী আর সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। শুধু বলিলাম, "না শচীন, এখানে আমি আর থাকতে পারব না।"

খাইতে ডাকিবার জন্য আসিয়া মনু শেষের কথাগুলি বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "থাকতে পারবে না! কে থাকতে পারবে না?"

শচীন বলিল, "রবীন কাল এখান থেকে চলে যাবে মনু। তা যাক। চেহারাটা ওর বড্ড ভাল; ঈর্ষ্যায় হিংসেয় শয়নে স্বপনে আমার আর সোয়াস্তি ছিল না কদিন।"

মনু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি যে ঠাট্টা কর রাতদিন!"

খাইবার সময় সেরাত্রে বিশেষ কোন কথা আর হয় নাই। দু'একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা অবশ্য শচীন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কাহারও দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া সেও চুপ করিয়া গেল।

অকস্মাৎ এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া ফেলিয়া অকারণেই

কেমন যেন লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল মন্নুও যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক ভাবে আমার দিকে চাহিতেছে। ভাত দিতে আসিয়া একবার চোখোচোখি হইতেই সে হাসিয়া বলিল, "আমাদের বিশ্রী রান্নায় বিরক্ত হয়েই বুঝি পালাচ্ছেন?"

"আর যা কিছু বলো ও-অপবাদ তুমি রবিকে দিতে পার না মন্নু। তোমার রান্না ত ছার, জেলের লাপ্‌শির সঙ্গে ফরাসী 'শেফের' রান্নার তফাৎ রবি বুঝতে পারে, এত বড় নিন্দে ওর অতি বড় শত্রুও করতে পারে না" বলিয়া শচীন হাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম হইতে উঠিলাম তখন বেলা বেশী হয় নাই কিন্তু সাধারণতঃ বেলা নয়টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা যাহার নীতিবিরুদ্ধ, সেই শচীনকে অত সকালেও ঘরে দেখিতে পাইলাম না।

নিজের সামান্য যে জিনিষ পত্র ছিল তাহাই একটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া ফেলিতেছি, এমন সময় মন্নু আসিয়া ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ও কি করছ?"

অকারণে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, "আজকে আমায় যেতে হ'বে।"

আর কিছু সে বলিল না, শুধু খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া নীরবে উঠিয়া গেল। তাহার নূতন সম্বোধনের বিস্ময় তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

জিনিষপত্র বাঁধা তখন হইয়া গিয়াছে। শুধু শচীনের সঙ্গে দেখা না করিয়া এবং আর একবার মন্নুদের নিকট ভাল করিয়া বিদায় না লইয়া একেবারে চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এক একবার সন্দেহ হইতেছিল, অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালে উঠিয়া শচীনের অন্তর্ধানও বোধ হয় আমায় ধরিয়া রাখিবার একটা ছল।

কিন্তু খানিক পরেই মনু আবার ফিরিয়া আসিল এবং দরজা হইতে আমার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে এবেলায় খাওয়া-দাওয়া না সেরে যেও না। আমি রান্না চড়িয়ে দিয়েছি।"

কিন্তু মনুর কথাতে সঙ্কল্প আমার যেন হঠাৎ স্থির হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ থাকিলে এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার মত মনের জোর থাকিবে কিনা সে বিষয়ে একটু ভয়ও বুঝি মনের ভিতর ছিল।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না না, এবেলা খাওয়া আমার আর হবে না মনু; আমায় এখনি যেতে হবে।" পুঁটলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

মনু হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এত ভয় পাচ্ছ কেন! আমরা জোর করে ধরে রাখব না।"

শচীন হইলে একথার জবাব বোধ হয় কিছু একটা দিতে পারিত। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলাম না।

মনু আবার হাসিল, বলিল, "ভদ্রতার খাতিরেও আমার কথার একটু প্রতিবাদ করতে ত হয়! এমন মুখচোরা লোক আসে দেশ উদ্ধার করতে? তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাও, বুঝেছ!"

বোবা সত্যই নই, কিন্তু সেদিন এই মেয়েটির সামনে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত অপরাধীর মত পুঁটলিটি লইয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনু প্রথমে দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু এক পা যাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া খপ্ করিয়া ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। এ কী অদ্ভুত ব্যবহার! আমার বিমূঢ় সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনু আবার হাসিয়া উঠিল।

"এখন যদি জড়িয়ে ধরে রাখি!"

এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় বলিবার মত কিছু ভাবিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আবার বলিল, "ভাবছ, কি বেহায়া নির্লজ্জ এই মেয়েটি,—না? ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ছে বোধ হয়!"

তাহার পর হাতটা আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "নাঃ, তোমার মত লোককে নিয়ে ঠাট্টা করাও পাপ।" এবং বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দরজায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার যা খুসী মনে কোরো, কিন্তু আমার ব্যবহারে সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাকেই যেন বিচার করে বোসো না, তোমার মত লোকের পক্ষে তা যদিও স্বাভাবিক!"

তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই। শুধু দেখিয়াছিলাম তখনও সে হাসিতেছে কিন্তু আচ্ছন্নের মত পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল, এমন হাসি তাহার মুখে কখনও যেন দেখি নাই!

কোথায় যাইব ঠিক কিছুই করি নাই। লক্ষ্যহীন হইয়াই পথ চলিতেছিলাম।

শচীন কখন হইতে পিছু লইয়াছে বুঝিতে পারি নাই। পিছন হইতে অকস্মাৎ পিঠে চাপড় মারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমন ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিস্ বল্‌ত? আমি যে পাঁচ মিনিট তোর পেছু পেছু আস্‌ছি!"

যাহা ভাবিতেছিলাম তাহা শচীনকে বলিবার নয়, নিজের মনের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এমন কথাও বলিতে পারি না। তাই তাহার

দিকে ফিরিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম "এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে ?"

সে কথার জবাব না দিয়া শচীন বলিল, "তাহলে সত্যিই চল্লি ! ভেবেছিলুম আমার সঙ্গে শেষ দেখা না করে অন্ততঃ যেতে পারবি না, কিন্তু তোরা হলি ভীষ্মের জাত, সব পারিস।"

মনুও যেন এমনি কথাই বলিযাছিল। উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলাম।

সঙ্গে যাইতে যাইতে শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু চলেছিস্ কোন্ চুলোয় ? তোর সে আগের আস্তানায় ত ওঠবার উপায় নেই জানি।"

সত্য কথাই বলিলাম—"এখনো ভেবে কিছু ঠিক করিনি।"

সে হাসিয়া বলিল, "ঠিক করবারই বা কি আছে ? কলকেতার রাস্তার ফুটপাথগুলো যথেষ্ট চওড়া, ভালো দেখে একটা গাড়ী-বারান্দা বেছে নিলে দেখেছি ঝড়বৃষ্টিও গায় লাগে না। মাথায় দেবার জন্য একটা ইট ? তাও দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং ভালোই থাকবি।"

তাহার কথার ধরণে হাসিয়া ফেলিলাম।

সে আবার বলিল, "আমার সংশ্রবে থাকতে ত আর পারবি না ; কিন্তু আমার একটা কথা শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ বোধহয় হবে না, কি বল ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কথা ?"

"ফুটপাথের চেয়ে সামান্য একটু ভাল জায়গা আমার জানা আছে। একান্তই ফুটপাথে শয়নের শপথ না নিয়ে থাকলে যেতে পারিস। বেশী কিছু নয়, একটা মেস। তবে নেহাৎ খারাপ লাগবে না। শুনেছি দেশের সেবায় অন্ততঃ তিনবার যে না জেলে গিয়েছে তার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং সানইয়াৎ সেন, ডি ভ্যালেরার দলে ভালই থাকবি বলে আশা করি।"

মেসের ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত সে বলিয়া দিল। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু তবুও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম।

শচীন নিজে হইতেই আমার মনের কথা বুঝিয়া বলিল, "না না, টাকা-কড়ির জন্যে ভাবতে হবে না। যখন সুবিধে হবে তখন দিলেই চলবে। শুধু নগদা চাই দেশ-প্রেম। তা যে তোর আছে, সে তারা দেখেই বুঝবে। আচ্ছা আসি তাহলে।" বলিয়া হঠাৎ বিদায় লইয়া শচীন চলিয়া গেল।

পথ খুঁজিয়া সে-মেসে গিয়া যখন পৌছিলাম, তখন দু'পহর হইয়া গিয়াছে। খদ্দরের গান্ধী টুপি পরিহিত একটি খর্ব্ব ক্ষীণকায় ছেলে মেসের দরজার দাঁড়াইয়াছিল, তাগাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম মেসে থাঁ্‌কিবার জায়গা আছে কি না।

পুরু চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া আমায় ক্ষানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে নিরীক্ষণ করিষা ছেলেটি বলিল, "আপনার নামই কি রবীন বাবু?"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "হাঁ"।

পরমুহূর্ত্তেই সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ছেলেটি বলিল, "বাঃ! আপনার জন্যেই ত অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম। দেরী হল যে?"

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিল, "আসুন এই ওপরেই আপনার সীট ঠিক হয়েছে।" এবং পুঁটলিটি আমার হাত হইতে এক প্রকার কাড়িয়া লইয়াই নিকটের সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল।

বাধ্য হইয়াই তাহার পিছু পিছু গেলাম কিন্তু রহস্যের তখনও সমাধান করিতে পারি নাই। একমুহূর্ত্তের পরিচয়ে বুঝিয়াছিলাম ছেলেটী কথা বলে বড় বেশী। সে অনর্গল বকিয়া চলিতেছিল। সিঙ্গল্ সীটের রুম ত আর এ মেসে নেই। ডবল সীট্‌ও এই একটি; আপনি থাকবেন বলে

নরেনকে জোর জবরদস্তি করে তুলে নীচে পাঠিয়ে দিলাম। সে কি সহজে যেতে চায়! জানেন ত, ওইখানেই ছিল রজনীবাবুর সীট্, রাজবন্দী রজনী মুখুজ্যে, বুঝেছেন ত?...

তাহার এ বাক্যস্রোতের ভিতর সামান্য একটু প্রশ্ন করিবার ফাঁক পাওয়া অসম্ভব জানিয়াই চুপ করিযাছিলাম। কিন্তু তাহার কথাতেই রহস্য শেষে পরিষ্কার হইযা গেল।

সে বলিতেছিল,—"আপনি আবার একটু নিরিবিলি ভালবাসেন শুনলাম, কিন্তু কি করবো বলুন, ঘর ত আর নেই, সব ঘরেই পাঁচ ছজন করে লোক। শেষকালে শচীনবাবু বল্লেন, তাহলে আর কি হবে, এই সীট্‌টাই তাকে দিও। তিনিত' একেবারে পুরো মাসের চার্জ্জই দিচ্ছিলেন, আমরা বল্লাম তাকি হয, এখানে কি আমরা ব্যবসা করতে বসেছি......

ছোট একটি বাড়ী—

তাহারই ভিতর শচীনের কথায বলিতে গেলে ভারতের ভাবী জন কুড়ি ডি ভ্যালেরা ও সান্‌ইয়াৎসেন ভীড় করিযা বাস করি!

কিন্তু ছোট হইলে কি হয় বাড়ীটী অশেষ স্মৃতি-সমৃদ্ধ।

এই বাড়ীরই কোন ঘরে নাকি দেশবন্ধু আসিয়া কবে ছেলেদের সহিত আলাপ করিযা গিযাছেন। এই বাড়ী হইতেই সুদূর মান্দালয়ের কারাগারে কোন দেশপ্রেমিক স্বদেশের জন্য আত্মবলি দিতে গিয়াছেন।

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার নাকি এ বাড়ীতে পুলিশের পদধূলি পড়ে।

বিনয়ের কাছে সে সমস্ত কাহিনী ইতিমধ্যেই কয়েকবার শুনিরাছি।

তাহার অনর্গল কথা বলিবার অভ্যাস সত্ত্বেও ছেলেটিকে বড় ভালো লাগে। সেই আমার ঘরের সঙ্গী।

তাহাকে দেখিয়া মনে হয় কোন দিক দিয়াই কৈশোরের স্বপ্ন কাটাইয়া উঠিতে সে পারে নাই। সে যেন বাড়ে নাই—কোন দিনই বুঝি বাড়িবে না। বালকের মত খর্ব্ব কৃশকায় এই ছেলেটির ভিতর এমন একটি আত্ম-বিলোপের ভাব আছে যাহাকে কাপুরুষতা বলিয়া ভুল করা অত্যন্ত সহজ। নিজেকে সে সকলের কাছেই ছোট করিয়া রাখিতে চায়। শুধু স্বপ্ন ও শ্রদ্ধাতেই বুঝি তাহার জীবনের সার্থকতা।

আকাশে চোখ তুলিয়াই সে চিরদিন মানুষের দিকে চাহিয়াছে—চোখ নামাইয়া কাহাকেও দেখিতে সে শেখে নাই।

তাহার সহিত আলাপ করিয়া বিস্মিত হই।

অবস্থা তাহাদের ভালো নয়। দেশে তাহার বিধবা মা আছেন। ছোট কটি ভাই বোনও আছে। অনেক আশা করিয়া নিজেদের সকলদিক দিয়া বঞ্চিত করিয়া বিধবা মা বুঝি ছেলেটিকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে ছেলে তাঁর ঘরে ফেরে নাই। বাঁচিয়া আছে কিনা সে খবরটুকুও সে পাঠায় না।

বিনয় করুণ ভাবে একটু হাসিয়া বলে—'ঘরে মা উপোসী আর আমি করছি দেশের সেবা—বিদ্রূপ করবার কথাই বটে!—না রবি-দা?"

তাহার পর নিজে নিজেই বলিয়া যায়—"কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলা মায়ের ছেলেরাই যে মরে গেছে রবি-দা। আমার মায়ের দুঃখু তার মাঝে আর কতটুকু।"

এমনি রঙীন বিনয়ের মন!

আর কাহারও মুখ হইতে শুনিলে বুঝি ন্যাকামিই মনে হইত কিন্তু তাহার মুখে কেমন যেন বেমানান মনে হয় না।

বিনয় বলিতে থাকে—"নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভুল ধারণা নেই রবি-দা। দেশ দূরের কথা, হয়ত আমার এক মায়ের দুঃখ দূর করবার ক্ষমতাও আমার নেই—আমি যে দুনিয়ার অপটু অক্ষমদের দলে তা আমি জানি, কি জীবনের ছোট কাজে ব্যর্থ হয়ে নিজের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে আমি চাই না রবি-দা।"

তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে,—"পাখা যখন পুড়বেই তখন এইটুকু সান্ত্বনা যেন থাকে যে প্রদীপ নয়, সূর্য্যকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই তা পুড়েছে।"

দুজনেই খানিক চুপ করিয়া থাকি।

জানালা দিয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বিনয় বোধ হয় তাহার অক্ষমতাকে কাব্যের রঙে রঙীন করিয়া তুলিতে থাকে।

আর আমি নিজের চিন্তার প্রচ্ছন্ন গতি সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়ি।

এই কয়দিন ধরিয়া আমার সমস্ত চিন্তা যে আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে সে আবর্ত্তের কেন্দ্র যে কোথায় নিজের কাছে কোনমতেই আর তাহা গোপন রাখা যায় না।

শুধু লজ্জিত নয় ভীতও হইয়া উঠি।

নারীকে বাদ দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতার স্বপ্ন অবশ্য কখন দেখি নাই। কিন্তু জীবনকে ছন্দোপতন হইতে যে বাঁচাইবে তাহাকে যে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছিলাম! নিজের কল্পনা ও পৃথিবীর কাব্যলোক হইতে চয়ন করিয়া মনের ভিতর যে তিলোত্তমাকে গড়িয়া ছিলাম, দ্বিধায় জড়িত

তাহার মৃদু গতি, ব্রীড়াবনত তাহার লাজরক্ত মুখ, আনত দৃষ্টিতে তাহার একান্ত নির্ভরতা—লতিকার মত সে আমার ঋজু সবল জীবনকে জড়াইয়া উঠিবাই সার্থক।

কিন্তু সমস্ত জীবনের উপর অসীম স্নিগ্ধতা বিস্তার করিযা যে আসিবে ভাবিযাছিলাম, সে কি আসিল সমস্ত জীবন মথিত করিযা প্রচণ্ড প্লাবনের মত!

নিজের ভিতরে চাহিযা দেখি, দিগ্বিদিকে মনের সমস্ত কূল বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন করিযা, বিচার, বুদ্ধি, সংস্কার, সমস্ত ভাঙ্গিযা উন্মত্ত বন্যা চলিয়াছে—এই কি প্রেম!

—এই কি জীবনে নারীব আবির্ভাব?

আমার কল্পনার নম্রনেত্র সঙ্গিনী সে নয। এত দূরে আসিয়াও তাহার সে দৃষ্টিব জ্বালা অন্তরের মাঝে অনুভব করিযা শিহরিযা উঠি। লতার মত জড়াইযা উঠিতে সে চায না, দুই সবল হাতে জীবনের সমস্ত মূল ধরিয়া সে যে আকর্ষণ করে।

ভীরু পাখীর মত যে নারী আসিয়া বুকের ভিতর আশ্রয় খুঁজিবে ভাবিযাছিলাম, সভয়ে চাহিযা দেখি তাহারই প্রবল আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিনিষত সংগ্রাম করিয়া নিজের পথে চলিবার স্বাধীনতা আমায় বাঁচাইযা রাখিতে হইবে,—অথচ এ সংগ্রামে জয়ী হইবার মত দুর্ভাগ্যও বুঝি আব কিছু নাই।

তবু সেই শপথই গ্রহণ করি।

হঠাৎ শচীনের কথায় আমার চমক ভাঙ্গে! কখন সে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছে লক্ষ্য করি নাই।

হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীরতার ভাণ করিয়া বলে—"আমি সন্তুষ্ট

হলাম বিনয়। দেশের জন্ত এম্‌নি তন্ময় হয়ে ভাবাই প্রয়োজন। নীচে বাড়ীওয়ালা মেসের ভাড়া চাইতে এসেছিল…তা আস্থক। ভাড়ার বদলে তোমাদের পালোয়ান ঠাকুর তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়েছে—তা দিক। তোমাদের মেসের গোলমালে অর্দ্ধেক কল্‌কাতা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—তা উঠুক, তোমাদের ধ্যান যে ভাঙ্গেনি এটুকুই আনন্দের কথা।"

বিনয় অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবার চেষ্টা করে। তাহাকে হাত নাড়িযা থামাইয়া শচীন বলিযা যায়—"দেশের সেবা করতে এসে কেউ কেউ শুধু হাত ছুটোই এগিয়ে দেয—হাত কড়া পরতে, কিন্তু মাথাও যে ঘামাতে হয় একথা তারা জানে না—"

শচীনের বক্তৃতা শেষ হয না। একমাথা ঝাঁকড়া চুল লইযা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন একটি বিশালকায় ছেলে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলে—"দেখ্‌ দিকি বিনয় কি আছে তোর বাক্সে? যা আছে সব বার করে দে! আজ বেটার নাকের ওপর সব টাকা ধরে দিয়ে কাল উঠে যাব। যা আছে দাও রবি-দা, তোমরা বার করে রাখ আমি এখনি আসছি।"

শেষ কথাগুলি তাহার বাহির হইতেই শোনা যায।

জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার যাহা জানিতে পারি তাহাতে বাড়ীওযালার বিশেষ অপরাধ আছে বলিযা মনে হয না। মাস আষ্টেকের ভাড়া বুঝি তাহার পাওনা হইয়াছে। তাহাই চাহিতে আসিযা স্বদেশী ছেলেদের বাড়ী ভাড়া দিবার ঝকমারী সম্বন্ধে কি একটা অপ্রিয মন্তব্য সে অসাবধানে বুঝি করিবা ফেলিয়াছিল। দেশের এ-অপমান আর সকলে হযত সহ্য করিতে পারিত কিন্তু আমাদের ঠাকুর পারে নাই। সেই খানেই গোলযোগের সূত্রপাত।

শেষ পর্য্যন্ত সকলের যথাসর্ব্বস্ব একত্র করিয়া যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাতে

দুই মাসের বেশী ভাড়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বাড়ীওয়ালার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় নিজের এ সৌভাগ্য সে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছে না।

দুই মাসের ভাড়ার সঙ্গে কোন কোন লোকের অন্যায় লোভ সম্বন্ধে দুইশত বাছা বাছা মন্তব্য করিয়া বাড়ীওয়ালাকে শোভান বিদায় দিয়া আসে। তাহার পর আমাদের ঘরে ঢুকিয়া ঝাঁকড়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—"আজ কিন্তু হরি-মটর!"

কয়দিনেই মেসের রীতিনীতি বুঝিয়া লইয়াছিলাম! সকালে আহারের পর বিকালে আর রান্না হইবে কিনা নিশ্চিত করিয়া কেহ এখানে বলিতে পারে না। একসঙ্গে দুই বেলা আহারের ভরসা এখানে খুব কম লোকই রাখে। সুতরাং বিস্মিত না-হইবার কথা।

কিন্তু তবু আজ কয়েকজনের মুখ চিন্তাকুল হইয়া ওঠে।

মেসের তহবিলের অবস্থা অন্য দিন অপেক্ষা আজ বুঝি একটু বেশী রকম খারাপ ছিল। বাঙ্গালীর খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, দেহের শক্তির সঙ্গে প্রটিনের সম্পর্ক, হিন্দুস্থানীদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস কোথায়, ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া শোভান সকলকে খাদ্য হিসাবে ছাতুর উপকারীতা পরীক্ষা করিতে রাজী করাইয়াছিল। উপায়ান্তর না থাকায় পরীক্ষা অবশ্য সকলেই করিয়াছিল কিন্তু পরীক্ষায় সন্তুষ্ট বোধহয় অনেকেই হইতে পারে নাই। সেই ছাতুর পর রাত্রে উপবাসের সম্ভাবনায় প্রসন্ন হইবার কথা নয়।

মেসের পরিচালনা শোভানই করিয়া থাকে। অতি বড় দুর্দ্দিনেও

পরাজয় স্বীকার করিতে তাহাকে দেখা যায় না। আজ তাহাকেও হতাশ দেখিয়া মন সকলেরি একেবারে দমিয়া যায়।

ম্লান হাসিয়া শোভান বলে, "চটে গিয়ে ভাড়াটা না চুকিয়ে দিলেই ভালো হ'ত। সব কটাকে বেচলেও এখন একটা পয়সা হবে না।"

বিনয় দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলে, "কিন্তু ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে! ঠাকুর উনুনে আঁচ দিলে নাকি?"

উনুনে আঁচ! এখানকার হালচাল ঠাকুরের অজানা ত' নয়! তিন বৎসর সে কাজ করিতেছে তাহার ভিতর এক বৎসরের মাহিনা তাহার বাকী। আহার্য্য সংগ্রহের পূর্ব্বে উনুন ধরাইবার মত মুর্খতা সে ত করিতে পারে না।

কিন্তু সত্যই উনুনে আঁচের ধোঁয়া উঠিতেছে। কৌতূহলী হইয়া সকলে নীচে নামিয়া যাই।

ঠাকুর লজ্জিত ভাবে জানায় যে, সে আজ মাহিনা পাইয়া মুদিখানা হইতে চাল ডাল কিছু কিনিয়া আনিয়াছে।

আমাদের এখানে কাজ করা ছাড়া সকাল-বিকাল রাস্তার দমকলের জল দিবার কাজ করিয়া ঠাকুর মাসে মাসে কিছু পায় বটে।

শোভান রাগিয়া বলিতে যায়—"এ তোমার ভারী অন্যায় ঠাকুর। তোমারই এক বছরের মাহিনা আমরা দিতে পারছি না—"

শচীন তাহাকে বাধা দিয়া বলে, "চুপ কর শোভান, মানুষের মহত্ত্বকে নীরবে সহ্য করতে হয়—প্রশংসা দিয়ে তাকে অহঙ্কারী করে তোলা পাপ!"

বিনয় এতক্ষণ যেন অভিভূত হইয়াছিল, বুঝি একটু বিরক্তির স্বরেই সে বলে,—"শচীন-দার সবেতেই ঠাট্টা।"

সেদিন চলিয়া যাইবার সময় হঠাৎ শচীন সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বলে,—"ওরে, মনু তোকে ডেকেছে, একবার যাস।" এবং বাহিরে গিয়া আর একবার চীৎকার করিয়া বলে,—"বিশেষ জরুরি, সেই জন্যেই এসেছিলাম।"

মনুর সহিত দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু দেখা করিতে যে যাই নাই, সে কথা ভুলিতেও কোনমতে পারি নাই।

দেখা করিয়া আসিলে বুঝি ব্যাপারটা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে চুকিয়া যাইত। দেখা না করার আত্মসংযমকে এমন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্মবঞ্চনা বলিয়া সন্দেহ করিয়া নিজের সহিত নিষ্ফল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইত না।

কিন্তু তাহা হইলে শপথ রক্ষা বুঝি হয় না।

চুপ করিয়া একাকী ঘরে বসিয়া সারাদিন মনু কেন ডাকিয়াছিল তাহা ভাবিয়া কাটাইলেও দোষ নাই। দোষ শুধু সেখানে একবার গেলে!

মনকে এমনি করিয়াই চোখ ঠারি।

দিন-তিনেক বাদে হঠাৎ সকালবেলা শচীন আবার আসিয়া হাজির! ভাবিয়াছিলাম মনুর ডাকে না-যাওয়ার কথাই বুঝি বলিতে আসিয়াছে, কিন্তু সে-ধারও সে মাড়াইল না।

তাহাতে আশ্বস্ত হওয়াই হয়ত উচিত ছিল কিন্তু কেমন যেন একটু হতাশই হইলাম।

বিছানার ধারে বসিয়া পড়িয়া শচীন বলিল,—"তুই এমন নির্লজ্জ, তা ত জানতাম না রবি!"

তাহার নূতন পরিহাসের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "অবাক্ হবার কিছু ত নেই বাপু। বলি এ মেসটা কি ধর্ম্মশালা না অন্নছত্র? বসে বসে চিরদিন অন্নধ্বংস করলেই চলবে?"

"কিন্তু নগদা দেশপ্রেম ত এখনও আমার আছে শচীন! এখানে আর কিছুরই দরকার নেই তুমিই ত বলেছিলে।"

শচীন দমিবার নয়, বলিল,—"কিন্তু তখন ঠাকুরের রোজগারে মেস চলেছে তা ত আর জানতাম না!"

শোভান বুঝি বাহিরেই ছিল। শচীনের গলা শুনিতে পাইয়া ভিতরে আসিযা বলিল—"যা-তা অপবাদ দিও না শচীন-দা—আজকাল আমাদের দস্তুরমত সল্‌ভেণ্ট অবস্থা, দরকার হলে মাসখানেক 'গেষ্ট' হযেও থাকতে পার।"

"ঠাকুর দিনে ত দমকল চালায়। রাত্রে তোমাদের জন্যে সিঁদকাটিও চালাচ্ছে না কি?"

"উঁহু—সে বড় দুঃখের কথা শচীন দা! ঠাকুর আমাদের ছেড়ে গেল।"

শচীন সত্যই বিস্মিত হইযা বলিল,—"কি রকম? এ মেসের ভেতর সেই ত ছিল সবচেযে বড় পেট্রিয়ট—মাইনে না পেয়েও যে দুবছর সখের চাকরি করেছে, সে হঠাৎ তোমাদের ছেড়ে গেল! এ ত বিশ্বাস করা যায় না।"

একটু থামিয়া শচীন আবার বলিল,—"নিশ্চয়ই তোমরা তার মাইনে চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই অপমানেই সে দেশত্যাগী হয়েছে।"

সকলের হাসি থামিলে বিনয় বলিল,—"না শচীন দা, ঠাকুর গিয়ে সত্যি ভারী অসুবিধে হয়েছে, এ-মেসের প্রত্যেকটি লোকের অমন যত্ন আর কেউ করতে পারবে না। আর গেল ত শুধু শোভানের দোষে।"

শোভান উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"আমার দোষে কি রকম?"

তাহার জবাব না দিয়া বিনয় বলিয়া চলিল,—"হঠাৎ ওঁর ধর্ম্মভাব জেগে উঠল, শুধু-মেজেতে থালা রেখে আর ভাত খাবেন না, তলায় গামছা পাততে সুরু করলেন। তাতেও কিছু হ'ত না। ঠাকুরের শোভানের ওপর অগাধ ভক্তি। আমরা মোছলমান বলে ক্ষেপালেও সে ঠাট্টা ভেবে হাসত! কিন্তু শেষে সকাল সন্ধ্যে ওঁর নমাজের বহর দেখে তার একটু সন্দেহ হল। তখনও তার বিশ্বাস একমাত্র শোভানের ওপর। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একদিন শোভানকেই জিজ্ঞেস ক'রে বল্লে,—"সকাল সন্ধ্যে ওসব আপনি কি করেন বাবু?" তখনও যদি শোভান কথাটা উড়িয়ে দেয় তাহলেও হয়। কিন্তু ও একেবারে সটান জবাব দিলে,—"আরে তাও জানিসনে? ওসব নমাজ পড়িরে—আমি যে মোছলমান।" তবু কি ঠাকুর বিশ্বাস করতে পারে।—শোভান তার কাছে একটা অবতার বিশেষ! অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে হেসে বল্লে, "আপনি ঠাট্টা কর্‌ছেন!" কিন্তু শোভান একেবারে নাছোড়বান্দা। তাকে বিশ্বাস করিয়ে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া শোভান বলিল,—"আর তখন শচীন দা, তোমার পেট্রিয়টের রাগ দেখে কে! আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লে! এতদিনকার দেশভক্তি ধর্ম্মের স্রোতে একেবারে তলিয়ে গেল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শোভান গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিল,—"চিরদিন হিন্দুর দেশ এমনি করেই তলিয়ে গেছে।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। বিনয় বলিল,—"সব কথাটা বলতে দাও শোভান। তারপর শচীন দা ঠাকুর ত রেগে মেগে চলে গেল। আমরা ভাবলাম, বেচারা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত্য করে একেবারে দেশেই ফিরে যাবে। কিন্তু তার পরদিন সকালেই আবার এসে হাজির, এবং একেবারে সটান্ শোভানের ঘরে। সেখানে গিয়ে শোভানকে শুধু পায়ে ধরতে বাকী রাখলে;—শোভানকে শুদ্ধি ক'রে সে হিন্দু করবে। তাদের গাঁয়ের একজন মুসলমানকে সে অমনিভাবে হিন্দু হতে নাকি দেখেছে। বলে—আপনি বাবু আসলে খাঁটি হিন্দু। সে আপনার আচার ব্যবহার দেখেই আমি বুঝেছি। আর-জন্মের সামান্য কি দোষ ত্রুটির ফলে এজন্মে ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মেছেন। আপনাকে শুদ্ধিতে রাজী হতেই হবে।"

শচীন উচ্চস্বরে হাসিযা উঠিযা বলিল—"বাঃ সব সমস্যার এত চমৎকার সমাধান। এমন আইডিয়াটা এল কিনা ঠাকুরের মাথা থেকে! তোমার ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত শোভান।"

শোভান কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

বলিল, "ঠাট্টার ব্যাপার নয় শচীনদা। তোমাদের ওই নিরীহ ঠাকুরের প্রস্তাবে সত্যি আমি ভয় পেয়েছি। মেসের উনুনের আগুন জ্বালতে জ্বালতে, ও একদিন দেশের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে দেখো, ওই ঠাকুর সাধারণ হিন্দুমনোভাবের মূর্ত্তরূপ আর শুদ্ধি-আন্দোলন সে মনোভাবের বিকৃতি প্রকাশ। এ আন্দোলনে মানুষ শুদ্ধ হয় কিনা জানি না, কিন্তু

দেশের মুক্তির দ্বার যে সকল দিক দিয়ে রুদ্ধ হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।”

শচীন একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। কথা কহিল না। তাহার পরিবর্ত্তে জবাব দিল শরৎ। শোভানের সহিত একই জেলার গ্রাম হইতে সে কলিকাতায় আসিয়াছে। মনের মিল তাহাদের যেমন নিবিড়, মতের ভেদও তেমনি গভীর। দুইজনকে কোন দিন কোন বিষয়ে একমত হইতে কেহ বুঝি দেখে নাই।

বিদ্রূপ করিয়া শরৎ বলিল, “তোমার অনুপ্রাস বা যুক্তি কিছুরই তারিফ করতে পার্‌লাম না শোভান। তোমরা যত খুশী হিন্দুকে মুসলমান করবে আর আমরা আজ যদি কটা মুসলমানকে হিন্দু করবার চেষ্টা করি তা হলেই দেশের সর্ব্বনাশ হ’বে এ যুক্তিটা কেমন যেন বেয়াড়া ঠেকছে।”

উত্তেজিত হইয়া শোভান বলিল, “শুধু মুসলমানকে হিন্দু করতে চাইলেই দেশের সর্ব্বনাশ হবে এমন কথা আমি ত বলিনি শরৎ। হিন্দু তোমার যত খুসী কর কিন্তু তোমার ঠাকুর ত আমায় শুধু হিন্দু করতে চাযনি, সে চেয়েছে আমার শুদ্ধি। আমরা ধর্ম্ম-প্রচার করতে গিয়ে বলি, তোমার ধর্ম্ম খারাপ আমার ধর্ম্ম ভালো, আমার ধর্ম্ম নাও। তোমরা আজ ধর্ম্ম-প্রচারে বেরিয়ে বলছ, তোমার দেহ অশুচি, তোমার স্পর্শ অপবিত্র, তোমায় শোধন করব। আমি ছুঁলে তোমার অন্নজল নষ্ট হয়, আমি চৌকাঠে পা দিলে তোমার মন্দির পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে ওঠে; পাশাপাশি বাস করেও এসব অপমান অনেক দিন ধরে সহ্য করে এসেছি। কিন্তু আমায় ধর্ম্ম দিতে এসেও নাক সিঁটকে তুমি বলবে, আগে তোমায় শোধন করতে হ’বে—এত বড় অপমানে আমার ধর্ম্ম শুধু নয় আমার মনুষ্যত্ব

পর্য্যন্ত বিদ্রোহী যদি হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা কি খুব আশ্চর্য্যের কথা হবে ?"

বিনয় বুঝি কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া শোভান আবার বলিল, "ফলে হবে এই, রেষারেষিতে ধর্ম্মের পাঁচিল আমরা এত উঁচু করে তুলব যে, সে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে দেশকে আর দেখাই যাবে না। এ অবস্থা দাঁড়াতেও বোধ হয় আর দেরী নেই ; আর এর জন্যে দায়ী একমাত্র তোমাদের সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ব।"

শরৎ হাততালি দিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "বাহবা মৌলবী সাহেব ! মুখ যে বেশ খুলেছে দেখছি। এই জন্যেই বুঝি কদিন ধরে কাণি পেতে খাওয়া আর কাছা খুলে ওঠ্‌বোস করার ধূম পড়ে গিয়েছিল ! আচ্ছা আপাততঃ শুদ্ধি আন্দোলনে ত দেশের সর্ব্বনাশ হবে বুঝলাম কিন্তু দেশের মুস্কিল-আসান করবার দাওয়াইটা কি হবে বাৎলে দিন।"

শোভান এবার হাসিয়া ফেলিল। শরতের মাথায় একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "মিছিমিছি তোদের সঙ্গে এতক্ষণ বকে মরলুম, ফাজিল কোথাকার ! কিন্তু দেখিস্ এই বলে রাখছি এদেশ যদি স্বাধীন কোন দিন্ হয় ত মুসলমান হয়েই হবে।"

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। শচীন বলিল "কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি শোভান। পৃথিবীর আর সব ধর্ম্মগুলোর কেমন যেন স্যাঁৎসেতে ভাব ; প্রাণটা মিইয়ে নিউড়ে দেওয়াই তাদের কাজ। এই একটিমাত্র ধর্ম্ম আছে, যা রক্ত গরম করে তোলে। দেখলে না ইস্‌লাম আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়েই দিগ্বিজয় করে ফেললে ; কাবুল থেকে স্পেন পর্য্যন্ত সব কাবার।"

শরৎ বলিল, "বেশ ত শচীন দা, মুসলমান হলেই যদি স্বাধীন হওয়া

যায় তাহলে এস না সবাই মিলে একবার কলমা পড়ে ফেলি। তারপর স্বাধীন হয়ে না হয় আবার শুদ্ধি করে খুড়ি অশুদ্ধভাবে হিন্দু হওয়া যাবে।"

শোভান হয়ত পাল্টা জবাব দিত, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কথাটা বুঝি পাল্টাইবার জন্যেই শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আসল রহস্যটারই যে এখনো মীমাংসা হ'ল না! তোমাদের মেসের হঠাৎ অবস্থা ফিরল কেমন করে তা ত বুঝলাম না।"

"বাঃ তাও জান না; আমাদের গোপাললাল যে বিয়ে করছে! গোপালকে মনে আছে ত? সেই যে দিনকতক খুব কোমর বেঁধে স্বদেশ উদ্ধারে লেগেছিল। তুমি বলতে ওটাকে বিশ্বাস নেই—ওটা ভিজে বেড়াল।" বলিয়া মুখ টিপিয়া শোভান হাসিতে লাগিল।

"মনে তাকে খুব আছে; কিন্তু তার বিয়ে করার সম্ভাবনার সঙ্গে তোমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন সংশ্রব ত খুঁজে বার করতে পারছিনে।"

"এমন আর কি সংশ্রব। বিয়ে করার আনন্দে পুরোনো বন্ধুদের সাহায্যে শ'তিনেক টাকা দিয়ে ফেলেছে আর কি!"

শচীন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিনয় বলিয়া উঠিল, "সব মিছে কথা শচীনদা।—শরৎ আর শোভান দু'জনে পরামর্শ করে গোপালের এই টাকাটি খসিয়েছে! একেবারে ডাহা 'ব্ল্যাকমেল'! সে বেচারী খদ্দর টদ্দর ছেড়ে ভাল ছেলেটি হয়ে কোথায় কোন পুলিশ ইনস্পেক্টারের একটি-মাত্র মেয়ের সঙ্গে বুঝি বিয়ের সম্বন্ধ জোগাড় করেছে! টাকা কড়ি বেশ কিছু নাকি পাবে, ভালো চাকরীর আশাও বুঝি আছে। শরৎ সেই খবরটি কোথা থেকে পেয়ে শোভানকে এসে যেই বলা, ও বললে, "দাঁড়া

মেসের হাল তাহ'লে ফিরিয়ে দিচ্ছি।" দুজনে মিলে তারপর পরামর্শ করে গোপালকে চিঠি লিখলে যে মেসে তিনশ'টি টাকা পত্রপাঠ না পাঠালে গোপালের ভাবী শ্বশুরের কাছে শোভান নিজে গিয়ে বলে আসবে যে, গোপাল বিপ্লববাদীদের দলের লোক। স্বদেশী ডাকাতদের পাণ্ডা বললেই হয়। ধরা যাতে সহজে না পড়ে সেই জন্যেই শুধু সে পুলিশের সঙ্গে এ সম্বন্ধটি পাতিয়ে রাখবার চেষ্টায় আছে। এই মেসে গোপাল এক বছর কাটিয়ে গেছে, প্রমাণ দিলে, তার শ্বশুর যে এসব কথায় কিছুতেই আর সন্দেহ করবে না একথাও শোভান লিখে দিল। সত্যিকারের ভয় কিছু থাক আর না থাক এ চিঠি পাবার তিনদিনের ভেতরেই দেখি গোপালেব মণিঅর্ডার এসেছে তিনশ টাকার।"

সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। শুধু শোভান ও শরৎ ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

পরের দিন শচীন আর ছাড়িল না।

তাহার সহিত সকালে বাহির হইতেই হইল। খবরের কাগজ বিক্রী করিতে হইবে। সেই খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া একদিন কেমন করিয়া বড়লোক হওয়া যাইবে তাহাই শচীন সারাপথ আমাকে বোঝাইতে বোঝাইতে চলিল।

শচীনের কথায় বুঝিলাম কলিকাতার শেয়ার মার্কেটে দালালী করার চেয়ে যদি কোন ভাল কাজ থাকে তাহা হইলে এই খবরের কাগজ বিক্রীই সেই ব্যবসা।

শচীন বলিতে বলিতে চলিল—"কলকেতার রাস্তার একটা মোড় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেশই একদিন দখল করব না তা কে বলতে পারে। খবরের আমরা হব পাইকিরি আড়ৎদার—একদিন হয়ত দেখবি আমাদের কারখানায় বাঙ্গলা দেশের সব খবর তৈরী হচ্ছে মিনিটে হাজার হাজার। রযটারও একদিন লণ্ডনের রাস্তায় কাগজ ফিরি করত!"

হাসিয়া বলিলাম, "তাই নাকি?"

"ঠিক জানিনা, তবে তা করলেই বা ক্ষতি ছিল কি!"

বলিলাম—"তোমার সাধ তাহলে কোনটা?—বড়লোক হওয়া না খবর তৈরী করা?"

শচীন বলিল—"দুটোই। বড়লোক না হলে নিজের জীবন ব্যর্থ আর খবর তৈরী করতে না পারলে দেশের আশা ভরসা নেই।"

আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া আবার বলিল—"এ যুগের রাজনীতি চলছে তৈরী খবরের ওপর। খবর তৈরী যাদের আয়ত্ত নেই দেশকে

কোন দিক দিয়ে চালাতে তারা পারবে না।' তৈরী না বলে খবর মেরামতও বলতে পারিস।"

"তাহলে কাগজ বিক্রী সুরু না করে কাগজ তৈরীর চেষ্টা করলেই ভাল হত না?"

"শনৈঃ শনৈঃ"—শচীন হাসিয়া পাশের একটা গলি দেখাইয়া দিয়া বলিল—"বাঙ্গালা দেশের ভাবী সংবাদ-সম্রাটদের অভিযান ওই গলিটি থেকেই সুরু হবে—চল।"

গলির ভিতর প্রকাণ্ড একটি পুরাণ বাড়ী! তাহার ভাঙা গেটের মাথায় বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে একটি সাইনবোর্ডে লেখা 'নির্ভীক'। সাইনবোর্ডটী নূতন। তাহার নূতন রঙের জৌলুষ বাড়ীর বার্দ্ধক্যকে ব্যঙ্গ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাইনবোর্ড না থাকিলেও বাড়ীটী যে খবরের কাগজের আফিস একথা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবার কথা নয়।

সকালবেলা। তখনও সমস্ত কাগজ ফিরিওয়ালা বিদায় হয় নাই; সারে সারে সাইকেল সেই অনতিপ্রশস্ত গলিপথে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভিতর হইতে কাগজের রাশ বাহিরে আসিতে না আসিতে কোথায় যে উধাও হইয়া যাইতেছে বুঝিবার উপায় নাই।

ফিরিওয়ালাদেরই ভিতর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ফিরি করিবার কাগজ কেমন করিয়া পাওয়া যায়। সাইকেলের উপর কাগজের বোঝা চাপাইয়া সে আমাদের দিকে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া গেল যেন আমরা তাহাকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখাইয়া দিতে বলিয়াছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিল না কিন্তু জাতিতত্ত্ব তুলিয়া বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিল যে বাঙালী ভদ্রলোকের এ কাজ নয়। তাহার চেয়ে বরং আমরা কোন আফিসে কেরাণীগিরির খোঁজ করিতে পারি। তাহার উপদেশ সত্ত্বেও পীড়াপীড়ি করায় সে বলিয়া দিল যে কাগজ দেওয়া না দেওয়া অর্জ্জুন সিংহের হাতে। তাহাকে আমরা একবার বলিয়া দেখিতে পারি। তবে কাগজ যে মিলিবে সে ভরসা কম। পুরাণ ফিরিওয়ালারাই চাহিদা মত কাগজ পায় না—নূতন লোক ত দূরের কথা।

তাহার মূল্যবান উপদেশ মনে রাখিয়া পদাতিক ও সাইকেল-ফিরি-ওয়ালাদের ভীড় ঠেলিয়া অর্জ্জুন সিংহের খোঁজে ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছি এমন সময়ে কে হাঁকিল—"ঠারিয়ে বাবু ভিতর যানে কা হুকুম নেহি!"

খবরের কাগজের অফিসেও পাহারা থাকিবে ভাবি নাই। দরওয়ানকে আমাদের সাধু উদ্দেশ্যের কথা জানাইতে যাইতেছিলাম। শচীন আমাকে চুপ করিতে ইসারা করিয়া বলিল—"ম্যানেজার বাবুকা সাথ মোলাকাৎ করনে মাঙতা—"

দরওয়ান তাহাতেও দমিল না, বলিল "স্লিপ্ ভেজিয়ে"—

গোড়াতেই যেখানে এত বাধা বিপত্তি সেখানে শেষ পর্য্যন্ত কিছু হইবে এ আশা আমার ছিল না। শচীনকে আমি নিরস্ত করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু শচীন তাহার আগেই একটা কাগজ লইয়া ইংরাজিতে লিখিয়া দিল। —"বিজ্ঞাপন দিবার জন্ত দেখা করিতে চাই—এজেন্ট, পপুলার কেমিক্যাল ওয়ার্কস।"

দরওয়ান স্লিপ্ লইয়া ভিতরে একজন বেহারাকে পাঠাইয়া দিল। আমি একটু সরিয়া আসিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"পপুলার

কেমিক্যাল ওয়ার্কস আবার কোথা থেকে এল্? কাগজ ফিরি করতে এসেছ ত জানতুম, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের এজেন্ট কেমন করে হলে বুঝতে পারছিনা ত।"

শচীন বলিল, "এমন নীরটে না হলে আর তুই দেশ সেবা করতে আসিস্। পপুলার কেমিক্যাল ওয়ার্কস সম্প্রতি গড়ে উঠেছে।"

একটু থামিয়া তাহার পর হাসিয়া বলিল—"আমার মগজে! আরে গাধা! খবরের কাগজের ম্যানেজার লাটসাহেবকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞাপন যে দেবে তাকে ফেরাবেনা জানিস?"

"কিন্তু তারপর!"

"একবার ঢোকা ত যাক্ তারপর দেখা যাবে।"

শচীনের অনুমান ভুল নয়! খানিকবাদেই বেহারা আসিয়া জানাইল, আমরা ম্যানেজারের কাছে দেখা করিতে যাইতে পারি।

বেহারা ভিতরে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। শচীন বলিল "থাক, তুমি তোমার কাজে যাও, ম্যানেজারের ঘর আমরা চিনি! আমরা ছাপাখানায় একবার হয়ে যাচ্ছি।"

বেহারা কি বুঝিল বলা যায় না কিন্তু চলিয়া যাইতে আপত্তি করিল না।

শচীন বলিল—"যাক্ পপুলার কেমিক্যাল ওযার্কসের বিজ্ঞাপনটা এবার আর নির্ভীকে গেল না।" বেহারার ভাগ্যেও একটু বকুনি আছে, তা থাক, এখন অর্জ্জুন সিংএর খোঁজ করা দরকার।"

এতক্ষণে চারিধারে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীটা পুরাণ হইলেও সুবৃহৎ, তাহার বিস্তৃত উঠানে করগেটের কযেকটী শেড্ তুলিয়া ছাপাখানা করা হইয়াছে। যে শেড্টির তলায় দাঁড়াইয়াছিলাম সেটি ছাদ পর্য্যন্ত রিল কাগজের বড় বড় পিপের মত বাণ্ডিলে বোঝাই।

তাহার পাশের শেড হইতে সিসা গলানর একটা অস্বস্তিকর গন্ধ আসিতে-ছিল।

কাঠের একটা তক্তার উপর একরাশ সাজান টাইপ লইয়া একটা লোক পার হইয়া যাইতেছিল, শচীন তাহাকে অর্জ্জুন সিং কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিল।

লোকটা দাঁড়াইয়া পড়িয়া আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—"অর্জ্জুন সিংকে কি হবে মশাই! প্রেসে কাজ চান ত আমাদের সুপারিটেন্ আশু বাবুকে ধরুন। কাজটাজ জানেন ভালো? খবরের কাগজে কখন কাজ করেছেন?"

কখনও যে করি নাই তাহা আমরা বলিবার পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়া সে আবার বলিল—"তাহলে হবে না মশাই। এ ফ্ল্যাটমেশিনের ঠুকঠাক কাজ নয়, একেবারে কলের মত হাত চলবে; তা না হলে এ মেড়ো সিংহকেই ধরুন আর যাকেই ধরুন কিছু হবে না।" আমাদের দিক হইতে কোন জবাবের আশা না রাখিয়াই লোকটা কলের মত হাত না হউক পা চালাইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। অর্জ্জুন সিংহের কোন সন্ধান দিবার প্রয়োজনই সম্ভবতঃ সে বোধ করিল না।

শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুন সিংহের সাক্ষাৎ যখন পাইলাম তখন তিনি একটী শেডের পাশে চারপায়া বিছাইয়া তাহার উপর অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন ও তাঁহার বিশাল মহিষাসুরের মত কলেবর দুইজন জোয়ান হিন্দুস্থানী তেল দিয়া ডলিতে ডলিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

শচীন কায়দাদুরস্ত ভাবে সেলাম করিয়া বলিল "সেলাম সিংজি, তবিয়ৎ আচ্ছা?"

ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত করিয়া অর্জ্জুন সিং আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আপকোত পছানতা নেহি।"

"কেমন করে আর চিনবে সিংজি! তোমার সঙ্গে আগে কি আর দেখা করবার সৌভাগ্য ঘটেছে।"

সিংজি এবার বাংলা করিয়া বলিলেন—"তোবে কি দোরকার আছে হামার সঙ্গে।"

"দরকার আর কিছু নয় সিংজি; শুনলাম তোমার ফেরিওয়ালারা নাকি সব কুড়ের ধাড়ি; বাজারে কাগজ কাটাতে পারছে না; তুমি দুজন ভালো ফেরিওয়ালা নাকি খুঁজছ, তাই এসে হাজির হয়েছি।"

সব কথার অর্থ সিংজি বুঝিলেন কিনা বলা যায় না, তবু মুখ তাঁহার হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইযা উঠিল। বলিলেন—"কে বোলে আমার কাগজ বাজারে কাটায় না? কে বোলে কে?" একটু থামিযা তাহার পর এ কৌতূহল দমন করিযা বলিলেন "যাও হামার ফেরিওযালার কুছ দোরকার নেই।"

"উঁহু! অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন সিংজি। দরকার নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ! আজই তোমার ঈশ্বর না করুন দুজন ফেরিওযালা ধর গাড়ী চাপাও ত পড়তে পারে! ভালো লোক পাচ্ছ যখন হাতে রাখা ভাল। তাহলে কালই এসে কাগজ নিয়ে যাব! কি বল সেই বন্দোবস্তই ভাল!"

এইবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। সিংজি কিন্তু চটিয়া উঠিযা বলিলেন—"কেয়া ঘড়বড়াতা! হাম তুমকো কাগজ নেহি দেগা—যাও দিক্ মৎ করো!"

শচীন এতক্ষণ চারপায়ার একপাশে বেশ গুছাইয়া বসিয়াছিল এইবার

উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"তাহলে আর কি করব বল সিংজি; আজ আসি! তবে আমাদের কথাটা মনে রেখো। আবার না হয় আরেক দিন এসে তোমার তবিয়তের খোঁজ নিয়ে যাব।"

প্রত্যুত্তরে সিংজি কি যে বলিলেন ঠিক বোঝা গেল না। আমরা উঠিয়া আসিলাম।

বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, শচীন থামাইয়া বলিল, "এলামই যখন তখন বাড়ীটা একবার ঘুরেই না হয় দেখা যাক্।"

হাসিয়া বলিলাম—"কিসের জন্য যে এলে তাত বুঝলাম না। ওই রকম করে কথা বল্লে কখন কাজ আদায় হয়!"

শচীন বলিল—"বিবেকের দংশন কাকে বলে জানিস্? আমি ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছি। তাই এইবার তার বিষ দাঁত ভাঙবার ব্যবস্থা করলাম। গড়িয়ে গড়িয়ে জীবনের অলস বেলা যখন আর কাটতে চাইবে না, মনের মধ্যে বিবেক যখন দীর্ঘ উপদেশের বক্তৃতা দেবার জন্যে উস্‌খুস করবে তখন তার সে আকুলতা শান্ত করবার মত জুৎসই কৈফিয়ৎ ত তৈরী হয়ে রইল। কাজ পাইনি, কিন্তু চেষ্টা করিনি একথা ত আর বলা চলবে না।"

কিন্তু শচীনের বিবেককে ফাঁকি দিবার প্রয়োজন হইল না। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরিয়া দোতালা হইতে নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় একটি ভদ্রলোক সম্পাদকের ঘরের কাটা দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"আপনারা কি 'মর্ম্মবাণী' থেকে এসেছেন?"

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই শচীন বলিয়া বসিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে ভেতরে আসুন। মিঃ সরকার আপনাদের খোঁজ করছিলেন।"

ভেতরে ঢুকিতে ঢুকিতে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু আপনাদের আরেকজনের আসবার কথা ছিল না ?"

শচীন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—"আজ্ঞে হাঁ৷ ছিল, কিন্তু তিনি বোধ হয় এসে উঠতে পারলেন না।"

শচীনের খেয়ালে এতক্ষণ কোন বাধা দিই নাই কিন্তু এইবার বিরক্ত হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিলাম—"এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে শচীন। এর ফল ভাল হবে না।"

শচীন সে কথার জবাব দিল না এবং আমার একটা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতেই ভিতরে লইয়া গেল।

মিঃ সরকার এ অফিসের কে জানি না। মর্ম্মবাণী হইতে কাহাদের আসিবার কথা এবং তাহাদের মিঃ সরকারের কি প্রয়োজন কিছুই আমাদের জানা নয়। এই বিপজ্জনক ব্যাপারে জোর করিয়া নির্ব্বোধের মত আমাকে জড়াইয়া দেওয়ার জন্য সত্যই এবার শচীনের ওপর রাগ হইতেছিল। এ ব্যাপার কি রকম দাঁড়াইবে বুঝিতে না পারিয়া আশঙ্কাও বড় কম হইতেছিল না, কিন্তু শচীন দেখিলাম নির্ব্বিকার। আশঙ্কা উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন তাহার মুখে নাই।

মিঃ সরকার টেবিলে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"আপনাদের জন্যে আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। আপনাদের আরো সকালে আসবার কথা ছিলনা ?"

"আজ্ঞে হাঁ৷, একটু দেরী হয়ে গেছে !"—শচীনই উত্তর দিল।

"আমাদের প্রুফ-রীডারের ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে ! আপনাদের কিন্তু কাল থেকেই কাজে লাগতে হবে। আজ লাগ্‌লেও ভাল হয়।"

"আজ্ঞে, আজ আর হবে না। কাল থেকেই আসব।"

"আর আপনাদের আরেকজন কোথায় ?"

শচীন অম্লান বদনে বলিল—"তিনি আসতে পারবেন না বলেছেন।"

মিঃ সরকার বলিল—"তাই নাকি ! যাহোক এখন দুজন হলেই কাজ চলে যাবে। আপনাদের কিন্তু এখন রাত্রে কাজ করতে হবে।"

"তা আমরা করব। তবে···"

মিঃ সরকার বলিলেন—"হ্যাঁ সে আমি ঠিক করেছি আপনাদের মাইনে সেখানকার থেকে বেশীই পাবেন। আর আপনাদের Appointment letter আজ ম্যানেজার সই করে রাখবেন। কালই না হয় নেবেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে ভাবনা নেই আমাদের ! তাহলে আজ আসি।" বলিয়া শচীন উঠিয়া পড়িল।

"তাহলে কালই রাত্রে আসবেন রাত্তির দশটায়। শচীনবাবু এদের রীডারের ঘরটা দেখিয়ে দিন।"

মিঃ সরকার আবার তাঁর লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। যে ভদ্রলোক আমাদের ডাকিয়েছিলেন, তিনিই আমাদের রীডারদের ঘর দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

শচীন একটু যাইয়া বলিল—"যাক ভালই হল, কাগজ বিক্রীর ওপর কোনদিনই বিশেষ ভরসা ছিল না। ফেরিওয়ালা থেকে রাইটার হওয়ার সম্ভাবনা বড় কম কি বলিস ?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কিন্তু এটা কি হল শচীন—তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে ?"

"এখনও হয়নি, কিন্তু কিছুদিন প্রুফ-রীডারি করলে হবে বলে আশা

রাখি। মাথাটা এত ভালো থাকা একটা ঝঞ্ঝাট, একটু খারাপ হলে মন্দ হয় না।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলাম—"এ হাসি-ঠাট্টার কথা নয় শচীন। তুমি কি সত্যি কাল এখানে আরেকজনের ছদ্মনামে আসবে ভেবে রেখেছ!"

শচীন কি একটা জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। তিনজন ভদ্রলোক সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। শচীন সটান তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিল—"আপনারা কি মর্ম্মবাণী থেকে আসছেন?"

একজন বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এঃ—বড় দেরী করে ফেলেছেন! মিঃ সরকার এই এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে গেলেন।"

তিনজনের মুখে হতাশার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে দেখিয়া সত্যই দুঃখ হইল।

শচীন বলিল—"কাল এমনি সময়ে আর একবার আসতে পারেন, কিন্তু আমাদের রীডারের যে রকম দরকার, এর মধ্যে লোক নিয়ে ফেলাও আশ্চর্য্য নয়। আপনারা যে বড় দেরী করে এলেন!"

একজন হতাশ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহলে উপায় কি বলতে পারেন?" সকলে মিলিয়া তখন বাহিরের দিকে চলিতে সুরু করিয়াছি। শচীন জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কি মর্ম্মবাণী ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে?"

"না এখনও ছাড়িনি ঠিক, তবে এখানে কথাটা পাকা হলেই ছেড়ে দিতাম।"

শচীন হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল—"তাহলে উপায় ভালোই আছে মশাই।"

সমস্বরে তিনজনে বলিলেন, "কি ?"

"মর্ম্মবাণী না ছাড়া !" শচীন হঠাৎ গলার স্বর গম্ভীর করিয়া বলিল —"কি লোভে আপনারা এখানে আসছিলেন বলতে পারেন ? এই দশ বছর এখানে খাঁড়ারী করছি মশাই—আমরা এখান থেকে ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি, আর আপনারা সেধে এখানে আসতে চাচ্ছেন ? অবশ্য এসব কথা আমার বলা উচিত নয় !"

কৌতূহলী শ্রোতাদের প্রশ্নে শচীন আবার বলিল, "আমার কথা যদি শোনেন মশাই, ও মর্ম্মবাণী ছাড়বেন না। মাসে মাসে মাহিনেটা ত ঠিক পান ওখানে ?"

"কেন এখানে ত শুনেছি মাহিনে ঠিক দেয় ?"

শচীন বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল—"শুনে থাকেন ভাল, তাহলে আর আমার বলবার কি আছে !"

"না না, আপনি এখানে কাজ করেন আপনি বেশী জানেন বই কি ?"

শচীন হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া চুপি চুপি বলিল, "তাহলে বলি মশাই শুনুন—অমন বোকামী করবেন না। শেষকালে পস্তাবেন। আপনাদের এ উপদেশ দেওয়ায় আমার স্বার্থ ত কিছু নেই। আপনারা আমার চাকরী ত আর কিছু কেড়ে নিচ্ছেন না, শুধু ভুক্তভোগী বলেই আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। তবে যদি মনে করেন, কাল এসে মিঃ সরকারের সঙ্গে কথা কয়ে দেখতে পারেন।"

কিন্তু যেভাবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন তাহাতে পরের দিন আর আসিবার বাসনা তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হইল না। শচীন আমার

দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"যাক, মনে একটা খুঁত ছিল—গেল। কারুর অন্ন মারতে আর হল না।"

বলিলাম—"হলেও বিশেষ আপত্তি তোমার হত না।"

শচীন বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"হওয়া উচিত নয়।"

খানিকদূর গিয়া শচীন বলিল—"এমন সুখবর মনুকে শুনিয়ে আসবি না? চল।"

কেন জানিনা সেদিন আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। খবরটা আদৌ সুখবর কিনা তাহা লইয়া শচীনের সহিত তর্ক করিবার অনেক কিছু ছিল। নিজের মনের সঙ্গে মনুকে শোনাইবার ব্যাকুলতা লইয়া বোঝাপড়া করিবারও প্রয়োজন ছিল হয়ত। কিন্তু সেদিন যেন এ সমস্তই অনর্থক মনে হইল। হয় হোক এ আমার দুর্ব্বলতা—সারা জীবন ধরিয়া যে নীতির বর্ম্ম অনেক রকম ঢালাই পিটাই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহাতে মস্ত বড় একটা ছিদ্র যদি দেখাই দিয়া থাকে দিক—তাহা লইয়া নিজেকে আর অনর্থক উৎপীড়িত করিবার উৎসাহ ছিল না। শচীনের মনের স্পর্শ লাগিযাই হয়ত আমার ভিতরে এ গভীর পরিবর্ত্তন সুরু হইযাছে ভাবিয়াও ভীত হইযা উঠিতে পারিলাম না!

পথে যাইতে যাইতে শচীন হঠাৎ বলিল—"তোদের গাঁযে কমলা বলে একটি মেয়ে আছে নারে?"

অবাক হইযা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কই, জানিনা ত!"

শচীন মুখ টিপিযা হাসিযা বলিল—"আহা কমলা না হোক, তার

নাম ধর বীণাই হল, নাহয় রেবাসেবা—নাম কি আর আমার মনে আছে ?"

হাসিয়া বলিলাম—"তা অমন কত আছে !"

"নারে অমন কত নয়, সেই একটি মেয়ের কথা বলছি, কাণে দুল কপালে টিপ, পায়ে আলতা, উঁহু পায়ে আলতা নয়, কোমরে জড়ান নীলাম্বরি সাড়ী, ছেলেদের সঙ্গে ডাঙগুলি খেলে, গাছের আগডালে উঠে পাখীর ছানা পাড়ে, রাগ করে একদিন তোর হাত কামড়ে দিয়েছিল। চলে আসবার দিন কেঁদে বলেছিল—"রবিদা আমিও জেলে যাব !"—কেমন ? "নেই এমনি একটি মেয়ে ?"

"না, মনে ত পড়ছে না !"

"ওহো ভুল হয়েছে তাহলে। পায়ে তার আলতাই হবে। লজ্জায় সামনে আসেনা এলে মাথা নীচু করে থাকে। পেছন ফিরলে মুখের দিকে চায়, চোখোচোখি হলে মুখ রাঙা করে চোখ নামায়, কথা কইতে গলা জড়িয়ে আসে—"

শচীন আরো অনেক কিছু বলিতেছিল।

বাধা দিয়া বলিলাম—"হল না শচীন !"

শচীন হাসিয়া বলিল—"না হোক্, আসল কথা তুই কাউকে ভালবেসেছিস ?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন ?"

"এমনি করলাম। বলনা বেসেছিস কাউকে ?"

বলিলাম—"এর উত্তর দেওয়া কি এতই সোজা শচীন ?"

শচীন আমার মুখের দিকে খানিক গম্ভীর ভাবে তাকাইয়া রহিল।

তারপর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"হয়েছে, ঘুণ ধরেছে তাহলে!"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তার মানে?"

"তার মানে, চোখে ঘোর না লাগলে কি আর কথা ঘোরালো হয়ে আসে!"

আমার পিঠ চাপড়াইয়া শচীন আবার বলিল—'সস্তা অনুপ্রাস নয়রে সত্যি কথা। আমাদের অসহযোগ আন্দোলনের রবীনকে চিনতিস্ ত? সে হলে শুধু এককথায় বলত—'ধ্যেৎ!' কিন্তু আমাদের এখনকার রবীন এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত মনে করে।"

খানিকবাদে হঠাৎ অন্য দিকে চাহিয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে শচীন বলিল—"মনু মেয়েটি সত্যই অদ্ভুত—নারে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার চেয়ে তুমিই ত বেশী জান।"

শচীন গম্ভীর হইয়া বলিল—"তা হয়ত জানি।"

মনুদের বাড়ী যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা দুপুর। সারা বেলা ঘুরিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর কিছু না হউক, এই দরিদ্র পরিবারটির আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়া তখন লুব্ধ হইয়া উঠিবার কথা। বাড়ীর কাছে আসিয়া ঢুকিতে যেটুকু দ্বিধা হইতেছিল, মনুর সযত্ন সেবার কথা স্মরণ করিয়া তাহা অনায়াসে জয় করিয়া ফেলিলাম।

কড়া নাড়িতে খানিক বাদে যখন দরজা খুলিয়া গেল তখন কিন্তু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম দরজা যে খুলিয়াছে সে লোকটি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খানিক তাকাইয়া লোকটি অপ্রত্যাশিত রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কাকে চান মশাই ?"

এরূপ সম্ভাষণের জন্ত সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না। কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শচীন কিন্তু সহাস্ত মুখে উত্তর দিল—"আপাততঃ কাউকে বিশেষ চাই না—একটু ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাধিত হব।"

লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল—"কে মশাই আপনারা ?"

যে ভাবে সে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহাতে আমাদের ভিতরে যাইতে দিতে সহজে সে সম্মত হইবে বলিয়া মনে হইল না। খবরের কাগজের আফিসে একবার দরওয়ান পথ রোধ করিয়াছে, খানিক-বাদে মন্মদের বাড়ীতে ঢুকিতেও বাধা পাইব এতটা আশা করি নাই।

শচীন বলিল—"আমাদের সুদীর্ঘ পরিচয়টা এই দরজায় দাঁড়িয়ে দেওয়াটা কি সঙ্গত হবে ? চলুন না ভেতরে গিয়ে আপনার সাধু কৌতূহল নিবৃত্ত করবার একটু চেষ্টা করে দেখি।"

লোকটা এত কথা বুঝিল কিনা বলা যায় না,—উষ্ণ হইয়া বলিল —"কাকে চান, বলতে পারেন না, দরজায় এসে কড়া নাড়ছেন কি রকম লোক আপনারা ?"

শচীন হাসিয়া বলিল—"পুলিশ কমিশনারের সার্টিফিকেটটা হারিয়ে এসেছি ; নাহলে আপনাকে এখনি প্রমাণ করে দিতে পারতাম, চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি রাহাজানি সকল প্রকার অভিযোগ থেকে আমরা মুক্ত এবং অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক। তবে কাকে চাই এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরটা অত তাড়াতাড়ি দিতে পারব না মশাই। জীবনে এ প্রশ্নটা এখনও গভীরভাবে আলোচনা করে দেখিনি।"

"শচীনের এই বাক্যবন্তা আরও কতক্ষণ চলিত এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইত বলা যায় না। দরজায় দাঁড়াইয়া এই অনর্থক বচসায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলাম, এমন সময় মনু আসিয়া সকল গোল মিটাইয়া দিল। দরজায় আগাইয়া আসিয়া বলিল—'এস'।

লোকটা এবার সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"এদের চেন নাকি?" তাহার পর দরজা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"তাই বুঝি আপনাদের কাকে চান বলতে বাধ্ছিল!" তাহার বিদ্রূপের হাসি যেমন স্পষ্ট তেমনি কুৎসিত। এক মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটির বাতাস যেন সে হাসিতে কলুষিত হইয়া উঠিল। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম।

শচীন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"মাফ্ করবেন মশাই, আমার এ তরুণ জীবনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য কখনও হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারছি না। আমাদের পরিচয়টা যখন অনুগ্রহ করে নিয়েছেন তখন আপনার পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

লোকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! আমার পরিচয় আর কি দেব বলুন! আপনাদের মত এঁর আপনার লোক ত আর নই, সম্পর্কে উনি আমার নিজের বৌদি হন।"

'তাহার জঘন্য শ্লেষে সর্ব্বাঙ্গ রিরি করিয়া উঠিল। শচীন কিন্তু তেমনি হাসিয়া জবাব দিল, "ওঃ এত দূরের সম্পর্ক! তাইত ভাবি আপনার লোক হলে এই তিন বছরে আর দেখা পাওয়া যেতনা। নিজের বৌদি যখন, তখন আর সেকথা বলা চলেনা বটে।"

লোকটা এবার আর জবাব দিল না; অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে ভিতরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, মনুও কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে।

কেন জানিনা এ বাড়িতে থাকিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। শচীনের ঘরে তাহার সহিত ঢুকিয়া বলিলাম—"আমি এখন যাই শচীন!"

শচীন বলিল—"যাবি বইকি! তোর এখানে মৌরসী পাট্টা হবার কোন আশা নেই, তবে এবেলার আহারটা সমাধা করেই যা।"

তাহার পর মনুকে ডাক দিয়া বলিল, "মনোরমা দেবী একটু কৃপা করে দর্শন দেবেন কি?"

মনু দরজায় আসিয়া বসিল—"কি বলছ?"

এতক্ষণে মনুকে ভালো করিয়া দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। আর যাহাই হউক মনুকে কোনদিন বিমর্ষ দূরের কথা গম্ভীর দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। আজ কিন্তু অবাক হইয়া দেখিলাম তাহার মুখে অপরিসীম বেদনা ও ক্লান্তির এমন একটি গাঢ় ছায়া নামিযাছে যে তাহাকে চেনাই দুষ্কর। মনে মনে কেন জানিনা তাহার একটি সাদর সম্ভাষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আমি যে তাহার ডাকে আসিয়াছি এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, এমন ইঙ্গিতও তাহার সেই ক্লান্ত মুখে দেখিতে পাইলাম না।

এটুকু শচীনও নিশ্চয় দেখিতে পাইয়াছিল তবু বোধহয় বাড়ীর আবহাওয়াটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্যই বলিল—"দুর্ব্বাসার চেয়ে তেজ আমাদের কয়েক ফারেনহাইট্ কম হতে পারে, কিন্তু অতিথি সৎকারের ত্রুটি হলে ক্ষমা করবনা মনে থাকে যেন মনোরমা দেবী। যাও তিনজনের মত আতপ তণ্ডুল আর কদলী সিদ্ধের আয়োজন করগে। রবীনকে এবারের আদম সুমারীতে 'দুজন' বলেই ধরা হয়েছে এবং ভুল করা যে হয়নি তা তুমিও জান।"

মনোরমার মুখের ছায়া সরিল না। শান্তভাবে বলিল—"তোমাদের খাওয়া আজ যে আর হয় না শচীন দা, আমায় এখনি যেতে হবে!"

"যেতে হচ্ছে? কোথায়?"—শচীনের পরিহাস-প্রীতি কোথায় তখন উবিয়া গিয়াছে।

এবার একটু ম্লান হাসিয়া মনু বলিল, "মেয়েরা যেখানে যায়—শ্বশুর বাড়ী।"

"কিন্তু—"

শচীনকে তাহার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া মনু বলিল, "না, 'কিন্তু' আর নেই শচীন দা! আমার শাশুড়ীর মৃত্যুশয্যার খবর নিয়ে আমার দেওর এসেছে; আমায় যেতে হবে।"

"জীবনে যাকে চোখে দেখতে আপত্তি ছিল, মৃত্যুশয্যায় তাকেই এত প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন ঠিক বুঝতে পারছিনা ত' মনু!"

"বোঝবার চেষ্টা আমিই যখন করিনি তখন তুমি কেন বৃথা করছ শচীন দা। শুধু আমি এবার ঠিক করেছি—যাব।"

শচীন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না—তোমার যাওয়া হতে পারে না মনু। তোমার ওপর কোন দাবী তাদের আর নেই, তাকি এরি মধ্যে ভুলে গেছ?"

"ভুলিনি বলেই ত যাব।"

শচীন অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"এ কথার প্যাচের সময় নয় মনু। নিজেকে এমন করে হত্যা করতে তোমায় আমি দেব না।"

"তাহলে থাক বৌদি"—

চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম মনুর দেওর আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত কুটিল ভাবে হাসিয়া সে বলিল—"তোমার গিয়ে

কাজ নেই ; ওঁর মতের বিরুদ্ধে তোমার যাওয়াটাত উচিত নয়। হ'লেই বা শাশুড়ীর অসুখ, যাওয়াটা ভালোও দেখাবে না।"

খানিক থামিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার তাকাইয়া আবার বলিল—"তোমাদের গোপন আলাপে বাধা দিয়ে ভাল করলাম না বোধ হয়।"

শচীন বলিল—"না ভালো করেননি। আরো খানিকক্ষণ আড়ি পাতলে অনেক কিছু মুখরোচক ব্যাপার শুনতে পেতেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।"

"তাহলেও ক্ষতি নেই ; না শুনেই যা বুঝেছি তাই যথেষ্ট। আমি চল্লাম বৌদি! মা একা সেখানে মরছেন সেই ভালো, তোমার হত্যাটা সেই সঙ্গে আর হবার দরকার নেই। মাকে ফিরে গিয়ে সজ্ঞানে দেখতে পেলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেই যেতে বলব।"

লোকটা চলিয়া যাইতেছিল। মনু হঠাৎ ডাকিয়া বলিল—"দাঁড়াও ঠাকুর পো, আমার সব কাপড়-চোপড় এখনও বাঁধা হয়নি।"

শচীন ও আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। লোকটা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"তার মানে?"

"তার মানে আর কিছুই নেই। আমায় নিয়ে যেতে এসেছিলে, নিয়েই যেতে হবে!"

মনুর দেওর কি বলিতে যাইতেছিল, মনু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"তুমি যদি না নিয়ে যেতে পার আমি নিজেই যাব—"

মনু চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কথাই আর হইল না। গাড়ী আসিলে নীরবে মনুর দেওর তাহাতে জিনিষ পত্র বোঝাই করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। মনুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া

মেয়েকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, শুধু শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে না পারিয়া শচীন আর একবার বলিল—"তুমি ভুল করলে মন্নু !"

মন্নু একটু মাত্র হাসিয়া বলিল—"ভুল করা না-করা আমার পক্ষে সমান কথা, এইটুকু আমি এত দিনে বুঝেছি শচীন দা।"

তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিতে হঠাৎ এতক্ষণ বাদে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"চল্লাম তাহলে, তোমার সঙ্গে হয়ত আর দেখাই হবে না।" এবং পরক্ষণেই তাহার সেই পুরাতন হাসিটি হাসিয়া বলিল—"তোমায় ভালো করে একদিন নাকাল করবার সাধ আর আমার মেটান হল না।"

হাসিতে গিয়া অকারণে চোখ জলে ভরিয়া গেল। কিছুই বলিতে পারিলাম না।

গাড়ী চলিয়া গেল।

স্তব্ধভাবে সেইখানে কতক্ষণ যে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। মন্টুর চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ জীবনে যে এত বড় অবসাদ এক মুহূর্ত্তে আসিতে পারে, এ কথা কিন্তু সত্যই ভাবি নাই। কতটুকুই বা এই মেয়েটিকে জানিতে পারিয়াছি, কতদিনেরই বা তাহার সহিত পরিচয়? সামান্য যেটুকু সম্বন্ধের সূত্র একদিন গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহাকে প্রাণপণে সেদিন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবারই চেষ্টা করিয়াছি, তবে অকস্মাৎ সমস্ত হৃদয় এখন শূন্য হইয়া যায় কেন? জীবনের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা আমার এ দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিতে চায়, কিন্তু যুক্তি-তর্কের [illegible] মনে হয় হৃদয় আমার এই অসীম বেদনার ভিতরেই নবজন্মের আভাষ পাইয়াছে।

হঠাৎ শচীনের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম মাথা নীচু করিয়া সেও কি ভাবিতেছে। আমার এতক্ষণের তন্ময়তা দেখিয়া সে না জানি কি ভাবিয়াছে মনে করিয়া, অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। তাহার গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিলাম—"শচীন!"

প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল—"হ্যাঁ, ক্ষিদে আমারও পেয়েছে।

বলিলাম—"ক্ষিদের কথা বলছি না।"

শচীন বলিল—"তেষ্টাও আছে বইকি! মন্টু গেছে যাক, আপদ গেছে, কিন্তু আমাদের উপবাসী রেখে যাওয়াটা তার ভাল হ'ল না। দেখে নিস্ রবীন্।"

শচীনের পরিহাসের সুর কিন্তু মনে হইল কোথায় যেন কাটিয়া যাইতেছে, তার হাসিতে সে উচ্ছলতা নাই।

বলিলাম—"এখন কি করবে?"

"পরিতৃপ্তি সহকারে আহার এবং তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা কোথায় মেলে, তা'ই সন্ধান করব। তার পরে একটু বিশ্রাম করতেও আমার আপত্তি নেই।"

"তাহলে চল আমাদের মেসে যাই"—

শচীন বলিল, "সেই ভাল। আহার, দক্ষিণা, বিশ্রাম—তিনটে একসঙ্গে না জুটলেও বিশ্রামটা সম্বন্ধে সেখানে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।"

মেসে গিয়া দেখিলাম ব্যাপার বিপরীত। সমস্ত মেসে আর তিল-ধারণের স্থান নেই। চারিধারে লোক গিজ গিজ করিতেছে তাহাদের বেশভূষা আচরণ কথাবার্তা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কলিকাতায় ইহকালের কোন প্রয়োজন লইয়া তারা আসে নাই, পরকালের পাথেয়-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করিতেই আসিয়াছে। খোঁজ লইয়া আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই জানিতে পারিলাম। বিনয় নাকি কি কাজে কালীঘাটে গিয়াছিল, সেখানে পাণ্ডাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া যূথভ্রষ্ট এই কয়েকটি পরিবারকে এখানে একদিনের মত আশ্রয় দিয়াছে।

বিনয়ের পরোপকার-প্রবৃত্তির উপর প্রসন্ন হইতে পারিতেছিলাম না। উপরে নীচে যেখানে চোখ পড়িল সব জায়গাতেই দেখিলাম একটা না

মিছিল

একটা উনুন বসিয়াছে এবং তাহাতে কাঁচা কাঠের আগুন হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম উঠিয়া সমস্ত বাড়ী এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে চোখে দেখা ও নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলা খুবই কষ্টকর।

সবশুদ্ধ গুটি পাঁচেক পরিবার। তাহাতে শিশু সন্তান সমেত নানা বয়সের পুরুষ ও নারীর সংখ্যা মোট প্রায় ত্রিশ হইবে। দেখিলাম ইতিমধ্যেই প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটাইয়া অত্যন্ত সহজে এই পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীর দল বাড়ীটিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

শোভান উৎসুকভাবে চারিদিকে, চাহিয়া কি খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার শোভান, এ হাটে খুঁজছ কি?"

শোভান উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "আমার একটা মুগুর কোথায় গেল বলত? একটা মুগুর রয়েছে আর একটা কোথা?"

শচীন বলিল, "এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক তোমায় বিতরণ করতে পারি। তুমি আশ্বস্ত হও, মুগুর তোমার সৎকার্য্যেই প্রাণ দিয়েছে।"

শোভান বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা রাখ শচীন দা। নতুন মুগুর এই কাল এনেছি।"

শচীন বলিল—"তাহলে তার তরুণ জীবন সার্থক। ওই উঠোনের কোণে ভদ্রলোকটীকে দেখছ, তৈলসিক্ত বিরাট বপুর ঘর্ম্ম গামছা দিয়ে মার্জ্জনা করছেন। সম্প্রতি ইন্ধনাভাবে আমি তাঁকে একটি মুগুর কুড়ুল দিয়ে চেলা করে উনুনের মধ্যে প্রেরণ করতে দেখেছি। সেটি তোমারই হওয়া সম্ভব।"

মিছিল

শোভানের মুখ দেখিয়া সে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছে, এমন মনে হইল না।

কাঁধে একবোঝা বাজার লইয়া এমন সময় দেখা গেল বিনয় অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু প্রবেশ করিতেছে। শোভান তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"এ সব কি ব্যাপার বিনয়!"

"ছাড়্-ছাড় আমার সময় নেই।"

কিন্তু শোভান তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল—"আমার একটা মুগুর তোমার এই অতিথি-আতুরদেব সেবায় গেছে বুঝেছ। সেটি তোমায় গড়িয়ে দিতে হবে।"

বিনয় অবাক হইয়া বলিল,—"মুগুর গেছে আতুর-সেবায়? মানে?"

মানেটা শচীনই পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিল। আমরাও শোভানের মুগুর-বিয়োগে যথোচিত সমবেদনা প্রকাশ করিলাম।

বিনয় কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে বলিল—"আহা, আরেকটা ত আছে।"

শোভান চটিয়া বলিল—"হ্যাঁ সেটা তোমার জন্যেই আছে।"

শরৎ কোথায় ছিল এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই, হঠাৎ আসিয়া বলিল—"আহা চট কেন শোভান তুমি না হয় তোমার হজযাত্রীদের একদিন এখানে বসিয়ে খাইও · তা'হলেই ত শোধবোধ।"

শোভান বোধ হয় কড়া রকমের একটা পাল্টা জবাব দিতে [illegible], শচীন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"আচ্ছা তোমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ ও জেহাদ থামাও। আপাততঃ বিনয়ের গণতন্ত্রের একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেওয়া দরকার।"

বিনয় কিন্তু তখন শোভানের হাত হইতে ছাড়া পাইয়া তাহার বাজারের বোঝা সমেত অন্তর্ধান হইযাছে। পরিচযটা নিজেদেরই উদ্যোগী হইয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

শচীন বলিল—"তোমার মুগুরের যিনি সদ্ব্যবহার করেছেন, তাঁকেই এ গণতন্ত্রের নায়ক বলে মনে হচ্ছে। পরের সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত কিছু মতামত আছে। এবং সে মত তিনি কার্য্যে পরিণত করতেও পরাঙ্মুখ নন, সুতরাং আলাপটা তাঁর সঙ্গেই আরম্ভ করা যাক্।"

লোকটা ঘাম মোছা শেষ করিযা তখন সেই গামছা দিয়াই প্রকাণ্ড একটি হাঁড়ি উনুনের উপর হইতে নামাইবার আয়োজন করিতেছিল।

শচীন আগাইয়া গিয়া বলিল—"গোঁসাইজি প্রণাম হই! রান্নাবান্নার কিছু অসুবিধা হল না ত?"

হাঁড়ি নামাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গোঁসাইজি [illegible] জানাইয়া বলিলেন—"আজ্ঞে কিছুনা, কিছুনা! আপনাদের, আর গুরুর কৃপায় কোন অসুবিধেই হয় নি।" তাহার পর সহসা যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া পরম ভক্তিভরে বলিলেন—"আর অসুবিধে হবার জো কি!

তাঁর ভোগ তিনি আপনি আয়োজন করে নেন! তু মুঠো পেসাদ বনে থাকি, অরণ্যে থাকি, কোন রকমে মিলে যায়ই—"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল, "তবে কি জানেন বনে যেমন সহজে মেলে অরণ্যে কি আর তেমনটি হয়? জঙ্গলে হলে ত আবার আলাদা কথা।"

শরতের কথার তাৎপর্য্যটা চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গোঁসাইজি খানিক সন্দিগ্ধ ভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বিশাল কলেবর কাঁপাইয়া হাস্যধ্বনিতে অঙ্গন মুখরিত করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মশাই! লীলাময়ের কাছে বনে অরণ্যে সব সমান। তাঁর কি আর স্থানকালের বন্ধন আছে?"

শচীনের গোঁসাইজি সম্বোধন দেখিলাম কোন দিক দিয়া অন্যায় হয় নাই। লোকটির গলায় তিনপুরু কণ্ঠী, কপালে তিলক। সকালে কালীঘাটে গঙ্গাস্নানটা সারিয়া আসিয়াছেন বোধ হইল সুপ্রচুর ঘর্ম্মের উপর বারবার গামছা প্রয়োগ সত্বেও স্থানে স্থানে 'শ্রীহরিচরণ'চিহ্ন এখনও টিকিয়া আছে, আচরণে কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার বিনয়ের সীমা নাই!

শচীন বলিল—"বলছিলাম কি, কোন কিছুর অভাব-টভাব হলে বলবেন। উনুনের কাঠটাঠ আরো লাগে ত বলুন এখনো আর একটা মুগুর আছে।"

"মুগুর!" গোঁসাইজি একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন—"হেঁ হেঁ মুগুর নিয়ে কি হবে বলুন, ভিখিরী বোষ্টম মানুষ!"

"বেশ বেশ না লাগে'ত আর কথাই নেই! তাহলে রবীন একেবার আহারটা গোঁসাইজির পেসাদ দিয়েই সারা যাক কি বল।"

গোঁসাইজি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "এমন সৌভাগ্য আমার হবে।"

শরৎ বলিল, "হবে বই কি! হবে বই কি! আমাদের ঐ একটা দোষ গোঁসাইজি, কারও কথা ঠেলতে পারিনি। বস হে রবীন, বসে যাও শচীনদা। শোভান আপত্তি না থাকলে তুইও বসে যেতে পারিস - ছোঁয়াছুঁযি না হলেই হল।"

গোঁসাইজির মুখের ভাব দেখিয়া দয়া হইল। বলিলাম, "আপনাদের অসুবিধে হবে না ত— কজনের মত মাপা রান্নাই ত হয়েছে!"

গোঁসাইজিকে কোন কিছু বলিবার অবসর না দিয়া শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল - "কিছু অসুবিধে হবে না হে, কিছু হবে না। এমন পেসাদ বিতরণ করাতেই ওঁদের আনন্দ, কি বলেন গোঁসাইজি?"

গোঁসাইজি করুণভাবে হাসিয়া বলিলেন "আজ্ঞে তা বইকি। তাহলে আর এক হাঁড়ি চড়াই?"

শচীন বলিল—"হ্যাঁ একটু চাপাচাপি করেই চড়াবেন, আমাদের আরো কজন এখনো এসে পৌঁছোয় নি।"

গোঁসাইজির মুখে যেটুকু 'হাসি' ছিল এবার মিলাইয়া গেল। ভীত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর ক'জন হবে?"

"কত আর, জন বারো হবে।" বলিয়া শরৎ হাঁক দিল, "ওহে বিনয় এদিকে একবার দর্শন দিও!"

আমাদের ভাবগতিক দেখিয়া বিনয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব

হইল না। বলিল, "এ তোমাদের ভারী অন্যায় শরৎ—অতিথির ওপর এ জুলুম—"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল—"আহা জুলুম কিসের, এবারে শোভানের আর একটা মুগুর ত যাচ্ছে!"

শোভান উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"কিন্তু তাতেও কুলোবে না, আমি তোর তক্তপোষটাও নিয়ে আসি।"

শরৎ অবিচলিতভাবে বলিল—"তা নিয়ে আসতে পারিস, তবে দাঁড়া ঠিকানাটা দিই! কাল পয়সার টানাটানিতে সেটা আবার এক দোকানে বেচে এসেছি।"

সারাদিনের পরিশ্রম ও উপবাসের পর আহারটা বেশ ভাল করিয়াই হইল। গোঁসাইজির আর কিছু না থাক, পাচক-বিদ্যাটা ভালোরকমই আয়ত্ত আছে দেখিলাম। শরৎ বলিল—"যাই বল ভাই লোকটা ভাল-মানুষ, নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা।"

শচীন বিনয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তোমার গণতন্ত্রের জয় হোক্ বিনয়, আজ সকাল থেকে যে ভাবে ব্যাঘাত সুরু হয়েছিল তাতে সারাদিনে কিছু জুটবে এমন আশা ছিল না।"

শোভান বলিল—"বিনয়ের গণতন্ত্রের পেছনে আমার একটি মুগুর আছে সেকথা ভুলোনা শচীন দা!"

"মুগুর না হলে কোন গণতন্ত্রই ভালো করে শেষ পর্য্যন্ত চলে না যে শোভান!"

বিনয় ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"তোমাদের এসব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না শচীন দা; আমার মনে হয় সত্যি সত্যি তোমাদের মনে এই

সাধারণ লোকদের প্রতি একটু অবজ্ঞা আছে! অথচ এরাই ত তোমার সত্যকার দেশ—"

বিনয়ের বক্তৃতা শেষ করা হইল না। নীচের উঠান হইতে সহসা যে কোলাহল কাণে আসিয়া পৌছিল তাহা উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। সকলে মিলিয়া ব্যাপারটা কি দেখিতে যাইতে বাধ্য হইলাম।

বাহির হইতে প্রথমে কিছু বোঝা সেই শব্দ-সমুদ্রের ভিতর হইতে অসম্ভব। একসঙ্গে তীর্থযাত্রীদলের সব কটি নারী ও পুরুষ-কণ্ঠ মুক্ত হইয়াছে—শিশুরাও কোথাও কোথাও যোগ দেয় নাই এমন নয়।

শরতের সেই নিরীহ গোবেচারী গোঁসাইজিকে কেন্দ্র করিয়াই আন্দোলনটা চলিয়াছে এটুকু বোঝা গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর সে শান্ত নিরীহ মূর্ত্তি কেমন করিয়া এমন রূপান্তরিত হইয়া গেল ভাবিয়া পাইলাম না। কাঁধের গামছা তিনি শক্ত করিয়া কোমরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, গলার এক ফেরতা কণ্ঠী যে কারণেই হোক্ ছিঁড়িয়া গিয়াছে; আরক্ত চোখ ও বিশাল মাংসল বাহু দিয়া তাঁহার তাল ঠুকিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, এরকম সংগ্রামে তিনি অনভ্যস্ত নহেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনই হোক না, এসব ব্যাপারে তৃণের মত সুনীচ বা তরুর মত সহিষ্ণু হওয়া তাঁর স্বভাব নয়।

অপর পক্ষের পাণ্ডাস্বরূপ হইয়া যে ব্যক্তিটি তর্ক করিতেছিল বাহু-বলের প্রতি তাহার তেমন ভক্তি নাই মনে হইল। শীর্ণ দীর্ঘ চেহারা; দেহের হাড়-পাঁজরাগুলি চামড়া ঠেলিয়া সকল জায়গাতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু দেহের শক্তির অভাব তিনি গলার দ্বারা পূরণ

করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার বাক্যের স্রোত যেমন প্রবল, আওয়াজও তেমনি প্রচণ্ড।

খানিক এ রণ-তাণ্ডব নিরীক্ষণ করিয়া শচীন বলিল—"ওহে, এ মহাযুদ্ধে তৃতীয় শক্তির আরবিট্রেশন প্রয়োজন।"

অনেক কষ্টে উত্তেজিত দুইপক্ষের অসংলগ্ন কথাবার্তা হইতে এইটুকু সংগ্রহ করা গেল যে আমাদের গোঁসাইজির নেতৃত্বে তাঁহার নিজের গ্রামের ও পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের গুটিদশেক পরিবার তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। কালীঘাটে কালী-মূর্ত্তি ও সেই সঙ্গে কলিকাতার যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের বাগান ও লালদীঘি প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দেখাইবার ভারও ছিল তাহার উপর। তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে সেজন্য কিছু টাকাকড়িও প্রত্যেকে দিযাছিল। এখন সেই টাকা লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। মাত্র কালীঘাট দেখাইযা অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য না করিযাই সে তাহাদিগকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে অথচ টাকা ফেরৎ দিবার নাম নাই। শুধু তাই নয়, কালীঘাটে পাণ্ডাদের ঘরে থাকিবার ভাড়া বাবদ যে খরচটা হইত সে খরচটা যখন বাঁচিযা গিয়াছে তখন তাহাই বা সে ফেরৎ দিবে না কেন?

গোঁসাইজি শেষ পর্য্যন্ত এসব কথায় অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—"যা, দেব না আমি টাকা। করগে যা কি করতে পারিস। পাণ্ডার ঘরের ভাড়া লাগেনি—সে আমি ফন্দি করে এ বাবুদের কাছে বাড়ী আদায় করেছি বলেই না। সে টাকা দেব কেন শুনি?"

শরৎ হতভম্ব বিনয়ের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল—"বিনয়, শোন।"

শীর্ণকায় লোকটি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বেশ ভাড়ার টাকা অমনিই যেত, না হয় তুই নিলি কিন্তু যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখাবি বলে যে টাকা নিয়েছিলি সে টাকা কোথায় ?"

গোসাইজি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন—"ইস্ কত টাকা দিয়েছিলি, কত টাকা ? চিড়িয়াখানা যাদুঘর সব মাগনা দেখা যায় না !"

তাহার পর এই টাকার কথা লইয়া যে কেলেঙ্কারী আরম্ভ হইল, স্ত্রীলোক শিশু সকলের সামনে যে ভাষা উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন তাহাতে ধৈর্য্য ধরিয়া চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব।

শচীনের সালিশীর চেষ্টা সেখানে থই পাইল না। বিনয় থামাইতে গিয়া একরকম অপমানিত হইল। শরৎ এবার চটিয়া মারমূর্ত্তি হইয়া বলিল —"না শচীন দা, আর পারা যায় না ; ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বদমায়েসগুলোকে বার করে দিয়ে আসি দাঁড়াও।"

কিন্তু শুধু ঘাড়ধাক্কায় তাহারা হটিবার পাত্র নয়। গোসাইজি তখন অপর পক্ষের কুষ্টী আওড়াইয়া বলিতে সুরু করিয়াছেন—"হাঁরে বিশে কুকুর ! তোকে আবার জানি না, নন্দপালের ভাইঝি দুটোকে কি জন্যে এনেছিস্ বলব তাহলে—বলব সকলের সামনে ? টাকা, আমার কাছে টাকা আদায় করবি তুই ? তার আগে তোকে জেলে দিতে পারি জানিস্ ?"

বিশে কুকুর তখন মরিয়া হইয়া বলিতে সুরু করিল—"আমাকে জেলে পাঠিয়ে তুই থাকবি কোথায়রে বদমাস, কোন লাটুসাহেবের শ্বশুর বাড়ি ? পঞ্চাশ টাকা আগাম নিস্‌নি তুই তার জন্যে ?"

শোভান ও শরৎ এবার সত্যই রাগিয়া আগুন হইয়া তাহাদের মারিতে যাইতেছিল।

শচীন তাহাদের থামাইয়া বলিল, "থালি মেরে তাড়ালে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না শোভান। এতদূর পর্য্যন্ত শুনে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না।"

আমিও শচীনের কথায় সায় না দিয়া পারিলাম না। এই দলের ভিতর নন্দপালের ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটি কাহারা, এখনও জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কিন্তু তাহাদের লইয়া একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্র যে চলিয়াছে, সে কথা জানিয়া শুনিয়া আর চুপ করিয়া থাকা যায় না।

শরৎ গোঁসাইজির স্থূল গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল—"চুপ, বদমাস চুপ, কোথায়, নন্দলালের ভাইঝি কোথায় এর মধ্যে? দেখা শীগ্‌গির!"

এক মুহূর্ত্তে গোঁসাইজির চালচলন, মুখের ভাব, কথাবার্ত্তা সমস্ত বদলাইয়া গেল। একবার সামনে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের শক্তির বহরটা একটু অনুমান করিয়া লইয়া সহসা একেবারে অত্যন্ত নরম হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"মারলেন আমাকে! তা মারুন, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে বেয়াদবী করলে দু'ঘা মারতে পারেন বই কি?"

শোভান বলিল—"ওসব ন্যাকামি রাখ্, নন্দপালের ভাইঝি দুজন কোথায় দেখা শীগ্‌গির, নইলে তোদের হাড়মাস আজ আলাদা করে দেব।"

সারা কলেবর কম্পিত করিয়া আর একবার উচ্চ অট্টহাস্য করিয়া গোসাইজি বলিলেন—"হ্যা হ্যা আপনারাও যেমন, ঝগড়ার মুখে কি বলেছি না বলেছি, তাই বিশ্বাস করে ব'সেছেন! আরে নন্দপালের ভাইঝিরা কি এখানে? তারা ত দেশে। না কি বলনা হে বিশু!"

বিশু ইতিমধ্যেই বিপদ বুঝিয়া বেশ সামলাইয়া লইয়াছে। একগাল

হাসিয়া বলিল—"ঝগড়ার মুখে ও আমাদের কত কি বেরোয় তাই কি পেত্যয় করতে আছে বাবু!"

শোভান তাহার গালে আরেক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "খবরদার, মিছে কথা বলেছিস কি পুলিশে দিয়েছি।"

গোঁসাইজি এবার আগের পথে সুবিধা হইল না দেখিয়া চাল বদলাইয়া বলিলেন, "কি, পুলিশে দেবে কি? মগের মুলুক নাকি! চল না পুলিশে দেখি কে কাকে দেয়? যত ভাল মানুষি করতে চাই ততই জুলুম, না!"

শরৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "পুলিশে তোমায় দেব না, জান গোঁসাইজি, এইখানে মেরে পুঁতে ফেলব, আমরা সব স্বদেশী ছেলে জান ত, কোন কিছু ভয় করি না।"

শরতের মুখের ভাব দেখিয়া হাসি পাইতেছিল কিন্তু গোঁসাইজির মুখ চোখ কেন জানি না শুকাইয়া উঠিল। স্বদেশী ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বুঝিলাম, আদৌ ভাল নয়। ধরা গলায় একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু—ওহে বিশু, বলনা ভাই আমরা নন্দপালের ভাইঝির কি জানি"—

কিন্তু তাঁহাকে আর জানাইতে হইল না। শুভ্র থান কাপড়ে অবগুণ্ঠিতা ছুটি মেয়ে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানাইল—"দোহাই বাবা আমাদের ঘরে পৌঁছে দাও, আমরা এসবের কিছু জানি না!"

খানিকক্ষণ বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; গোসাইজি ও তাহার সঙ্গীটিকে অত করিয়া ধমকাইবার সময়েও মনে মনে একটা আশা ছিল যে ইহারা অত বড় পিশাচ নাও হইতে পারে, হয়ত সত্যিই হতভাগিনী মেয়ে দু'টি তাহাদের দেশে এখনও আছে। সাহস করিয়া পাষণ্ডেরা এখানে তাহাদের আনে নাই। যাহাদের দেখিতে চাহিতেছিলাম তাহাদের এখন সামনে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু গোসাইজি খানিক হতভম্ব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়ে দুটির সামনে আসিয়া হাত-পা আস্ফালন করিয়া প্রায় মারমুখি হইয়া বলিলেন -"তবেরে নচ্ছার ছুঁড়িরা, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে শিখেছ? --না?"

অপরূপ ভঙ্গিতে মুখ ভেংচাইয়া তিনি আবার বলিলেন,—"আমাদের বাড়ীতে পৌছে দাও বাবারা, আমরা এর কিছু জানি না! কেন? এরা কি তোদের বাবা খুড়ো? সোহাগ জানানো হচ্ছে!"

মেয়ে দু'টি সে আস্ফালন দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া গেল।

শোভান ও শরৎ গোসাইজিকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল, "খবরদার, এখানে চোখ বাড়িয়েছ কি পিটিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব।"

তাহার পর মেয়ে দুটির দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাদের কোথায় বাড়ী মা?"

মেয়ে দুটি কুণ্ঠিত ভাবে যে গ্রামের নাম করিল তাহার নাম অবশ্য কখনও শুনি নাই। কোন্ জেলায় বাড়ী, কোথা দিয়া যাইতে হয় কিছুই

তাহারা জানে না দেখিলাম। তাহারা অন্যান্য সহযাত্রীদের সহিত সরল বিশ্বাসভরে তীর্থ দর্শন করিতেই আসিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র যে থাকিতে পারে, এ কথা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

বুঝিলাম, গোসাইজিকে হাজার ধমকাইলেও সত্য কথা এখন তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইবে না। মেয়ে দুটির ঠিকানা অন্য উপায়ে আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

শোভান বলিল—"পুলিশ ডেকে এনে ধরিয়ে দিই।"

শচীন হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ মেয়ে দুটির লাঞ্ছনা এত অল্পে যাতে শেষ না হয়, তার ব্যবস্থা কর।"

"কিন্তু তা'হলে কি হবে?"

একটু চিন্তিত হইবারই কথা। দলে পুরুষ মাত্র দুচারজন এবং তাহারা সকলে অন্য সময়ে যাহাই হউক এখন দেখিলাম একতাসূত্রে গভীর ভাবে আবদ্ধ। তাহাদের গাঁয়ের লোককে কলিকাতার গোটা কয়েক 'ভলেন্টিয়ার' ছোকরা জব্দ করিবে, এ তারা প্রাণ থাকিতে সহিবে না। তাহাদের কাছ হইতে কোন কথাই আদায় করা দুষ্কর। দলের স্ত্রীলোকেরা সকলেই অজ্ঞ। রেলে চড়িয়া কালীঘাটে আসিয়াছে এইটুকুই তাহারা জানে; গ্রামের নামও বলিতে পারে কিন্তু আর কিছু খবর দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়ে দুটিকে লইয়া সত্যই ভাবিত হইয়া পড়িলাম। এই পাষণ্ডদের হাতে তাহাদের কোন মতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অথচ পুলিশে খবর দিলে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটীকে অশেষ প্রকারে হয়রাণ হইতে হইবে, এই আশঙ্কাই হইতে লাগিল।

সুযোগ বুঝিয়া গোঁসাইজি বলিলেন, "কেন আমাদের মিছিমিছি হয়রাণ করছেন মশাই ? আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে—এটা কি আপনাদের ভাল হচ্ছে ?"

শোভান তাহাকে এক ধমকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "শচীন দা, সোজাসুজি না হয় মার দিয়ে এদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে দেখছি।"

শচীন কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে আপত্তি জানাইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া গোঁসাইজির সঙ্গীটিকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। গোঁসাইজি প্রথমে একটু হতভম্ব হইলেও ক্রমশঃ দেখিলাম, উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন। মার খাওয়ার সম্ভাবনা দূর হওয়ায় তিনি বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

মেয়ে দুটিকে নানা প্রশ্ন করিয়া এবার আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহার কিছু আঁচ পাইলাম। দুইজনেই তাহারা বিধবা। কাকার সংসারে বাস করিলেও নিজেদের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে। সে সম্পত্তি তাহাদের কাকা হস্তগত করিবার চেষ্টা কয়েক বার ইতিমধ্যে করিয়াছেন। কাকার প্রতি অবিশ্বাসের কিছু কারণ না থাকিলেও ইহাতে তাহারা রাজী হয় নাই। এবারে তাহাদের কাকা যেন কিছু বেশী রকম

উত্তোগী হইয়াই তাহাদের তীর্থযাত্রায় পাঠাইতেছেন, এ সন্দেহ তাহাদেরও মনে হইয়াছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রার আনন্দে সে কথা লইয়া বেশী কিছু ভাবিয়া তাহারা দেখে নাই।

এতদূর শুনিয়াও কিন্তু মেয়ে দুটিকে লইয়া যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহার কোন স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

মেয়ে দুটীর কথার মাঝে মাঝে গোসাইজি এতক্ষণ অত্যন্ত করুণ স্বরে টীকা দিতেছিলেন।

"এতটুকু বেলা থেকে তোদের কোলে পিঠে করেছি, আমি হলাম দুষ্মণ, আর কোথাকার কে এই কটা ছোঁড়া তারাই হল তোদের আপন? হায় রে কলিকাল!

এই নাক-কাণ মলা বাবা, পরের ভালোতে আর কখন থাকব না। ভাবলাম আহা কখনও কোথাও যেতে পায় না, আমার ছ্যাথতা যদি তীর্থ-ধর্ম্ম একটু করতে পায় ত ক্ষতি কি? এখন কিনা আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা!"

শরৎ ও শোভান অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। শরৎ বলিল—"শচীন দা আবার কি করতে গেল বল দেখি! সব জায়গায় বুদ্ধি খাটান চলে না, বাহুবলেরও ক্ষেত্র আছে, শচীন দা তা বোঝে না।"

কিন্তু শচীনের বেশী বিলম্ব হইল না। খানিক বাদেই সে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার সঙ্গীটাকে কোথায় রেখে এলে?"

শচীন হাসিয়া বলিল—"তার সমস্ত পাপ গ্লানি মোচন করে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে এলাম। এতক্ষণ বোধ হয় কাবায বস্ত্র পরে আমার কল্যাণের বাণী প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েছে।"

গোঁসাইজি এসব কথা বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ভীত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁ্যা সে বিশে ব্যাটা পালাল!"

"পালাবে কেন গোঁসাইজি! আপনাদের গোপন বন্দোবস্তের কথা বলে ফেলবার পর দেখলাম, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার তেমন আগ্রহ নেই। তাই তাকে আমিই যাবার অনুমতি দিয়েছি।"

গোঁসাইজির মুখ এবার সত্যই শুকাইয়া গেল—অত্যন্ত করুণ ভাবে তথাপি সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আমায় ফাঁসিযে বাছাধন কেমন করে নিষ্কৃতি পান্ আমিও দেখছি! ডুবি যদি আমি, সকলকে জড়িয়ে ডুবব! সে নন্দ পালকেও আমি ছাড়ছি না।"

শচীন গম্ভীর হইয়া বলিল—"ছাড়া উচিত নয় বলেই ত মনে হয়।"

"নয়ই-ত! আমি না হয় টাকাই খেয়েছি, আর সে ব্যাটা খায় নি। আর নন্দ পাল সম্পত্তির লোভে আমাদের যে ঘুষ দিয়েছে সে যাবে কোথায়?"

শচীন তেমনি গম্ভীর হইয়া বলিল—"সব দিক ভেবে দেখলে আসল

পাজী সেই নন্দ পাল। "আপনার নিষ্কলুষ জীবনে ক্ষণিক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে কাঞ্চনের মোহে আপনার না হয় সামান্য পদস্খলন হয়েছে কিন্তু--"

গোঁসাইজি বিমূঢ় ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে?"

"বলছি যে আপনি কিছু টাকাই না হয় নিয়েছেন, এখনও কিছু ত করেন নি। কিন্তু এ মেয়ে-দুটীর সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র ত নন্দপালের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। সেই ত বদমায়েসের ধাড়ী।"

অন্ধকারের মধ্যে আবার আলোকের আভাষ দেখিতে পাইয়া গোঁসাইজি বলিলেন--"বলুন ত, আপনিই বলুন না। আমি যে টাকা নিয়েছি তারই বা প্রমাণ কি! আর এদের আমি সত্যই ত কিছু করিনি এখনও।"

শচীন বলিল, "নিশ্চয়, আপনার ওপর কোন রকম অভিযোগই ত দাঁড়াতে পাবে না, বিশেষতঃ আপনি যদি সাফ্ সব কথা বলে দেন। কিন্তু সে বেটা নন্দপালকে ছাড়া উচিত নয়। কি বলেন?"

গোঁসাইজি আরো উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়।"

শচীন বলিল—"তার শাস্তি যদি না হয় তাহলে সংসারে ধর্ম্মের জয় আর কেউ গাইবে না।"

"আজ্ঞে না।"

শচীন গোঁসাইজির কাণের কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া গলার স্বর অত্যন্ত নামাইয়া বলিল- "বিপদ যদি হয় ত সেই নন্দপালেরই হবে। আপনাদের সে বলেছিল কি?"

গোঁসাইজিও গলা নামাইয়া বলিলেন- "আমি সে-সব কিছুর মধ্যে ছিলাম না মশাই—ওই বিশে ব্যাটাই সব!"

"সেকি আর আমরা বুঝিনি! তবু শুনেছিলেন ত ব্যাপারটা!"

গোঁসাইজি অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বলিলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা শুনেছিলাম বইকি ; সে বড় নোংরা ব্যাপার মশাই, সে আর কি বলব ?"

শচীন উৎসাহ দিয়া বলিল—"তবু—"

গোঁসাইজি বলিলেন, "ওই নন্দ পাল কি কম শয়তান ! মেয়ে ছুটোকে পারলে ও বিষ খাওয়াতো। কিন্তু তাতে হাঙ্গাম হতে পারে ভেবে নচ্ছারটা শেষে ঠিক করলে কি মেয়ে ছুটোকে কলকাতার কালী দেখবার নাম করে পাঠিয়ে কোন রকমে হারিয়ে গেছে বলে ফেলে আসবার ব্যবস্থা করাবে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ?" দেশে এসে রটিয়ে দেবে তারা বেরিয়ে গেছে ! তখন কোন রকমে ফিরে এলেও তাদের চরিত্রে বিশ্বাস করছে কে ? ঘরেই বা কে নিচ্ছে ? সমস্ত সম্পত্তি একেবারে নন্দলালের মুঠোয় !"

শচীন গম্ভীর ভাবে বলিল—"হুঁ—আপনাদের গ্রামটা হল তাহলে—?"

গোঁসাইজি অসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রামের নাম ঠিকানা সবই দিয়া ফেলিলেন।

শচীনকে এই সমস্ত কথার ভিতরেও হঠাৎ অকারণ হাসিয়া উঠিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

হাসিয়া সে বলিল, "ওহে শরৎ, তোমাদের বিশে ওরফে বিশ্বেশ্বর বাবুর এতক্ষণ নিঃসঙ্গ কারাবাস বোধহয় অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁকে তোমার ঘরের শিকলিটা খুলে বার করে নিয়ে এস।"

"বিশে তাহলে যায় নি !" গোঁসাইজি সবিস্ময়ে বলিলেন।

শচীন বলিল—"না, তবে, তাঁর কোন দোষ নেই; আমার কাছে কোন কথা ভাঙতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে যেতে আমিই দিই নি!"

"বিশে কিছু বলে নি আপনাকে তাহলে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্কল্প দেখলাম আপনার চেয়ে কিছু দৃঢ়। তাই আপনার কাছে কিঞ্চিৎ কৌশল প্রয়োগ করে আমাকে কথাগুলো আদায় করতে হল। আপনি হয়ত অসাধু ভাষায় একে অন্য আখ্যা দেবেন, তা দিন, কিন্তু দোহাই অপরাধ নেবেন না।"

গোসাইজির মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময়, ক্রোধ, বা ক্ষোভ—কোন্ ভাবের প্রাধান্য ঘটিয়াছে ঠিক বোঝা গেল না।

শচীন সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওহে বিনয়, তোমাদের কাউকে ত এ মেয়ে দুটিকে পৌঁছে দেবার ভার নিতে হয়। গোসাইজি ধর্ম্মভীরু লোক, এ সমস্ত ব্যাপারের পরও নন্দপালের ঘুষটা বেমালুম হজম করতে ওঁর হয়ত সঙ্কোচ হতে পারে। ওর সঙ্গে মেয়ে দুটীকে পাঠাতে ঠিক সাহস হচ্ছে না!"

শোভান বলিল, "আমি যাচ্ছি!"

শচীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, দিনকাল খারাপ নারীরক্ষা করতে গিয়ে শেষে হরণের দায়ে পড়ে যাবে!"

শরৎ ততক্ষণ বন্দী বিশেকে মুক্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠিক হইল সে-ই মেয়ে দুটিকে তাহাদের গ্রামে পৌঁছাইয়া তাহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে।

গোল বাধিল গোসাইজি ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গকে লইয়া। বিনয় বলিল—"ওদের আর ধরে রেখে কি হবে শচীনদা? ওদের ছেড়ে দেওয়া যাক।"

কিন্তু শোভান ও শরৎ তাহাতে রাজী নয়।

শরৎ বলিল—"ওদের কিছু দণ্ড না দিয়ে যেতে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।"

বিনয় একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "দণ্ড দেবার আমরাই মালিক নাকি?"

শোভান বিনয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"মালিক না হতে পারি কিন্তু তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি। আর মালিকের বিচারের বহর ত' সারা জীবন ধরেই দেখলাম। ও দেওযানি আদালতের বাড়া। এ জন্মের মামলার রায় তিনি আর জন্মের আগে দেবার ফুরসৎ পান না। তার চেয়ে আমরা হাতে হাতে চুকিযে দিই সেই ভাল।"

বিনয় গম্ভীর হইয়া বলিল—"দণ্ডটা তাহলে কি হবে?"

শরৎ বলিল—"সেইটেই ভাববার বিষয।"

তাহাদের ভাবিতে সময় দিযা শচীনের সহিত উপরে চলিযা গেলাম। সারাদিন শরীর ও মনের উপর দিযা যে সকল গিযাছে এতক্ষণে তাহার ফল টের পাইতেছিলাম। সমস্ত দেহ ও মন ক্লান্তিতে যেন একেবারে ভাঙ্গিযা পড়িতে চাহিতেছিল। কিন্তু বিশ্রাম করিতেও কেন জানিনা ভয করিতেছিল। মনে হইতেছিল বিশ্রাম করিতে গিযাও শান্তি আমার মিলিবে না। সারাদিন যে বেদনাটিকে বাহিরের হুজুগে মাতিযা দূরে ঠেলিয়া রাখিযাছি, তাহাই সামান্য একটু অবসর পাইবামাত্র সমস্ত মন অধিকার করিযা বসিবে। সে বেদনার সহিত নিঃসঙ্গ আলাপ করিতে সত্যই সাহসে কুলাইতেছিল না। সেই বেদনার আলোয হযত নিজের মনের এমন অভাবিত পরিচয মিলিবে যাহা সহ্য করিবার শক্তি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শচীন অন্য ঘরে চলিযা যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিযা বসাইলাম।

ক্লান্ত সে আমার চেয়ে কম হয় নাই, কিন্তু তাহার মুখে যে ছায়াটি পড়িয়াছে শুধু ক্লান্তি তাহার জন্য দায়ী নয় মনে হইল।

শচীনকে ডাকিয়া বসাইলেও, কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। যে কথাটি মনের সামনে সবকিছু আড়াল করিয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য কি-ই বা বলা যায়!

শচীনই এ বিপদ হইতে আমাকে মুক্তি দিল, বলিল—"দেখ্ একা শরৎকে মেয়ে দুটির সঙ্গে পাঠিযে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। মেয়েদুটিকে নিয়ে বেগ সেখানে অনেক পেতে হবে, শরৎ একলা সামলাতে পারবে না। আমিও যাব ভাবছি সঙ্গে।"

বলিবার কথা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাচিলাম—"আমি গেলে হয় না?"

শচীন বলিল—"হবে না কেন, কিন্তু অনেক ঝঞ্ঝাট—।"

হাসিয়া বলিলাম—"ঝঞ্ঝাটই একটু চাই।"

শচীন কি জানি কেন পরিহাসের চেষ্টা পর্যান্ত করিল না। আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে খানিক তাকাইয়া বলিল "তবে তুইও সঙ্গে যা।"

তাহার পর অনেকক্ষণ কোন কথাই হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর আব্ছা হইয়া আসিতেছিল। দুইজনে চুপ করিয়া সেই অস্পষ্ট আলোয় দুই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। এমন ভাবে চুপ করিয়া থাকা শচীনের অভ্যাস নয। তাহার এ ভাব দেখিতে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক।

নিজেই যাহোক একটা অবান্তর কথা বলিতে যাইতেছি এমন সময় শচীন হঠাৎ বলিল—"বাসন্তীপুরে একবার না হয় নামিস্—ওই লাইনেই পড়বে।"

অবাক হইয়া বলিলাম—"বাসন্তীপুর ?"

শচীন বলিল, "হ্যাঁ, মনুর শ্বশুরবাড়ী ওইখানে !" এবং পরক্ষণেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

গোসাইজি ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গের ব্যবস্থা শরৎ ও শোভান মিলিয়া কি করিল তাহারা জানে। পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম রাত্রিটা তাহারা এইখানেই কাটাইয়া ভোর না হইতে বিদায় লইয়াছে। শরৎ ও শোভান সারা সকালটা আমাদের এড়াইয়াই চলিল, গোসাইজি সম্বন্ধে কি রায় তাহারা দিয়াছে তাহাদের কাছে আদায় করা গেল না, সকল কথা ফাঁস করিয়া দিল বিনয়। বলিল, "দেখ ত শচীন দা, শরৎ আর শোভানের অন্যায়। আচ্ছা গোসাইজি আর সেই বিশ্বেশ্বরেরই না হয় দোষ আছে, কিন্তু তার জন্যে দলের সকলকে সাজা দেওয়াটা কি উচিত ?"

নেহাৎই ধরা পড়িয়া গিয়া শোভান প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"সাজা কি রকম ? এ রকম সৎকার্য্যে দান করার সুযোগ কার মেলে—"

শচীন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এবারের শুভকার্য্যটা কি ?"

শরৎ উত্তর দিবার আগেই বিনয় বলিল, "আমাদের প্রতুলের একবার প্রত্নতত্ত্বে বাতিক হয় মনে আছে ত! রংপুরের কোথা থেকে একটা হাত পা ভাঙ্গা মূর্ত্তিও সে-সময়ে সংগ্রহ করে এনেছিল! তারপর অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও সেটাকে নটরাজ বা অর্দ্ধনারীশ্বর বলে যখন প্রমাণ করা গেল না, আমাদের এখনকার পণ্ডিতেরা সেটাকে পুরোণ মাইল-

পোষ্ট বা ওই রকম কিছু ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী হলেন না, তখন সেটা চোর কুঠুরিতে ফেলে রেখে দিয়েছিল।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"তার সঙ্গে এদের সাজার কি সম্বন্ধ ?"

বিনয় বলিল, "শুনুন মা, সম্বন্ধ আছে বই কি! রাত দুপুরে সেইটে কুঠুরি থেকে ঘাড়ে করে নামিয়ে এনে শরৎ বল্লে—এ হচ্ছে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি। মা এখানে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। গোসাইজি আর তার দলবল মিলে তাঁর প্রতিষ্ঠার খরচাটা দিয়ে দিলেই তাদের সাতখুন মাপ হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারা তাই বিশ্বাস করে দিলে নাকি টাকা ?"

শরৎ এবার বলিল—"দেবে না ? অন্য ভাবে চাইলে যদি বা না দিত, ভদ্রকালীর মূর্ত্তি শুনে বিশ্বাস করুক আর না করুক ভয়ে দিলে! যাদের সাজা হবার নয় তারাই বেশী দিলে এই যা দুঃখ।"

বলিলাম—"এ তোমার ভারী অন্যায় শরৎ, মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে এরকম হাসি তামাসা করাটা আমার ঠিক মনে হয় না।"

বিনয় সায় দিয়া বলিল—"আর তা ছাড়া এ ত' শুধু হাসি তামাসা নয়, ডাহা জুয়াচুরি।"

শরৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"হুঁ, কিন্তু গোপালের সে দুশ' টাকা ফুরিয়ে এল তার খবর রাখ ? কালীঘাটের পাণ্ডারা খেত, তার বদলে না হয় ভদ্রকালীর নাম করে আমরাই কিছু নিলাম। তাতে রাগ করবেন, মা কালী এমন অভদ্র নয়।"

বিনয় বলিল—"তাহলে কালীঘাটের পাণ্ডা হলেই ত চলে, স্বদেশ-সেবার ভান করবার দরকার কি ?"

শরৎ জবাব দিল, "দ্বিতীয় ভাগ পড়ে ত আর স্বদেশ-সেবা করতে

আলিনি! সদা সত্য কথা বলিব, কাহাকেও ফাঁকি দিব না, এমন কোন প্রতিজ্ঞাপত্রেও 'স্বাক্ষর' করিনি।"

বিনয় সত্যই রাগিয়াছিল, বলিল, "তোমাদের এই সামান্ত হাসি ঠাট্টা মজা করার সথ ক্রমশঃ কোন দিকে বেড়ে চলেছে তা বুঝ্‌তে পারছ? যারা স্বদেশসেবাকে ব্রত বলেছিলেন তাঁরা নেহাৎ না বুঝেই ও শব্দটা ব্যবহার করেন নি। নীতিকথাগুলোকে দ্বিতীয় ভাগ বলে ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু মনের ভিৎ এধারে ওধারে একটু আধটু আলগা করতে করতে সমস্তই একদিন ধূলিসাৎ হযে যেতে পারে।"

শরৎ বিনয়ের বক্তৃতা কি বলিয়া থামাইতে যাইতেছিল, কিন্তু বিনয় তাহার বাধা উপেক্ষা করিয়া বলিয়া চলিল, "নীতির বাঁধনে মনের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে বল্‌তে পার কিন্তু সঙ্কীর্ণ না হলে শক্তিও বাড়ে না একথাও স্বদেশ-সেবাকে যারা ব্রত করতে চেয়েছেন তাঁরা জানেন। যাকে নির্দ্দোষ লঘুতা ভাবছ ধীরে ধীরে তা তোমাদের সমস্ত মনে কি ভাবে ছড়িযে যাচ্ছে তা তোমরা জান না।"

শরৎ হাতের আঙ্গুলে গুণিযা গুণিয়া বলিল, "ব্রত, ধূলিসাৎ, পরিসর, নির্দ্দোষ লঘুতা—তোর মতামত যাই হোক বিনয ভাষা তোর প্রাঞ্জল হচ্ছে স্বীকার করতেই হবে।"

শচীন আগাইযা আসিযা তাহাদের ঝগড়া থামাইয়া দিয়া বলিল, "ওহে শরৎকে ট্রেণ ধরতে হবে, ওর হযে আমি না হয তোমার সঙ্গে লড়ছি!"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "না শচীনদা, সত্যি আমার ভয় হয় শুধু শরৎ নয় আমরা এ যুগে সবাই অতিরিক্ত চালাক হতে গিয়ে জীবনকে ব্যর্থ করছি।"

শচীন বলিল—"ব্যর্থ যখন হতেই হবে তখন বোকামী করে ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে চালাকী করে ব্যর্থ হওয়ায় বাহাদুরী আছে বই কি।"

"আমার কথা তুমি বুঝলে না শচীন দা, আমাদের এ চালাকীর পেছনে মনের গভীরতা নেই, অত্যন্ত ক্লান্ত অত্যন্ত উদাসীন মনের এটা একটা ভাসা-ভাসা চঞ্চলতা মাত্র। আমরা শুধু এর দ্বারা মুখ বেঁকাতেই শিখেছি আর কিছু নয়। কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে সব কিছুকে ছোট করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছি। আগেকার লোকদের তুলনায় আমরা সব দিক দিয়েই মাথায় খাটো মনে হয় না কি?"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"তোমাকে দেখে তা মনে হয় বই কি। কিন্তু তোমার ও স্পেশ্যাল কমপ্লেক্সের কথা আলোচনা নাই করলে এখানে।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। শচীন বলিল, "শরৎ ফিরে আসুক বিনয়, আলোচনাটা গভীর ভাবে করা যাবে।"

শরতের সঙ্গে মেয়ে দুটিকে পৌঁছাইয়া দিতে আমিও চলিলাম।

হাওড়া হইতে ঘণ্টা কয়েক রেলে গিয়া একটি জংশন ষ্টেশনে নামিতে হয়। সেখান হইতে সরু আর এক লাইনে ছোট আর এক গাড়ীতে চড়িয়া মেয়ে দুটির দেশের ষ্টেশনে পৌঁছাইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি মাঠের মাঝখানে টিনের ছাউনি-করা ছোট একটি নগণ্য ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। এই ষ্টেশন হইতে ক্রোশ দুই খোলা মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেই মেয়ে দুটির গ্রাম মিলিবে, এইটুকু বিবরণ গোসাইজির নিকট সংগ্রহ করা গিয়াছিল। যান বাহনের

কোন বালাই এখানে নাই। অনেক পয়সা কড়ি খরচ করিলেও গ্রামে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিলে পাল্কি যোগাড় করা যায়, কিন্তু তাহার জন্তও দিন সাতেক আগে হইতে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন। গরুর গাড়ী চলে বটে কিন্তু তাহারও বিশেষ কোন পথ নাই, কখনও মাঠের উপর দিয়া, কখনও অসমতল বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। সেই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কোনরকমে দেহের হাড় ক'খানাকে সংলগ্ন অবস্থায় গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়াই নাকি কঠিন!

যাহাই হউক এমন গরুর গাড়ীতে চড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ হইবার কোন আশঙ্কা দেখিতে পাইলাম না।

আমরা ছাড়া ষ্টেশনে কেহই আর নামে নাই, নীল একটি নিশান দুলাইয়া যে লোকটি অলস ট্রেণটিকে এক প্রকার যেন তাড়া দিয়াই সম্প্রতি ষ্টেশন হইতে বাহির করিয়া দিলেন, তিনি ব্যতীত ষ্টেশনেও অন্য কোন জন প্রাণী দেখা গেল না।

লোকটির বেশভূষা একটু অদ্ভুত। পরণের কাপড়টি যেমন ছোট, তেমনি ময়লা, কোন রকমে হাঁটুর নীচে তাহাকে নামান যায় নাই। গায়ে তাঁহার কাপড়েরই অনুরূপ মলিন একটি গেঞ্জি। কিন্তু পোষাক যাহাই থাক, মাথা দেখিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদা নির্ণয় করিতে দেরী হইল না। মাথার টুপি দেখিয়া বুঝিলাম তিনিই ষ্টেশন মাষ্টার। এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির টিকিট বেচা হইতে টিকিট আদায় ইত্যাদি সকল কাজই তাঁহাকে অবশ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম বা কষ্ট খুব বেশী আছে, তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল না। হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল দিব্য নধর চেহারা, চুল পাকিয়াছে কিন্তু মুখে দাগ পড়ে নাই। মুখে যে হাসিটি লাগিয়া আছে তাহাতে সরলতা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই হয়ত একটু বেশী হইবে,

তবু তাহা ভাল লাগে। আমাদের টিকিট লইয়া তাঁহার চলিয়া যাইবার বিশেষ আগ্রহ নাই দেখিলাম।

খানিক এদিক ওদিক চাহিয়া বারকয়েক নির্বোধের মত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা যাবেন কোথায় ?"

তাঁহার কথার ধরণ শুনিয়া মনে হইল এই নির্জ্জন ষ্টেশনে নিঃসঙ্গ ভাবে দিনের পর দিন বাস করিয়া মানুষের সহিত দুদণ্ড আলাপ করিতে পাওয়ার সৌভাগ্যটাই তাঁহার কাছে সব চেয়ে লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের গন্তব্য স্থানের নাম শুনিয়া বলিলেন, "ও সে ত প্রায় দুক্রোশ রাস্তা, এই সন্ধ্যের সময় যাওয়া ভারী মুস্কিল হবে না ? আপনাদের সঙ্গে আলো আছে ?"

শরৎ বলিল, "না নেই, কিন্তু থাকলেও বিশেষ সুবিধা হত না। কারণ আলোর পথ দেখতে পেলে আমরা চিনতে পারতাম বলে মনে হয় না। আমরা এই প্রথম সেখানে চলেছি।"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সরল মুখে সত্যকার উৎকণ্ঠা দেখা গেল। বলিলেন, "তাহলে ত পথ চিনে যেতে পারবেন না মশাই, ভারী ঘোরাল পথ কিনা—"

এরূপ আশঙ্কা আমাদের আগেই হইয়াছিল, ষ্টেশন মাষ্টারের কথায় তাহার সমর্থন পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই দুটি অসহায় নারীকে লইয়া এই রাত্রে পথ খুঁজিয়া যদি তাহাদের গ্রামে পৌঁছিতে না পারি, তাহা হইলে কি বিপদেই পড়িতে হইবে। তবু শেষ আশায় ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের পথ দেখিযে নিয়ে যেতে পারে এমন কাউকে দিতে পারেন না ? আমরা না হয় বক্‌শিস দিতাম।"

মিছিল

"বক্‌শিস ত দেবেন কিন্তু নেবে কে ?" বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার মশাই নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া মাৎ করিয়া দিলেন।

হাসি থামিলে বলিলেন—"কেষ্টা বেটা থাকলে অনায়াসে সঙ্গে যেতে পারত ; কিন্তু সন্ধ্যার পর সে বেটাকে ত এসে অবধি একদিন দেখলাম না। বেটার এখানে নাইট ডিউটি কিনা ?"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের হাসি দেখিয়া বোঝা গেল, এটাও তাঁহার একটি অতি প্রিয় রসিকতা।

কেষ্টার পরিচয় গভীর রহস্যান্ধকারে আবৃত হইলেও তাহা অপসারণের চেষ্টা তখন আর করিলাম না। বলিলাম—"তা হলে আর লোক পাওয়া যাবে না, কি বলেন ?"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় মুখ বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—"আমিই ত দিতে পারতাম আপনাদের এগিয়ে মশাই কিন্তু সাড়ে আটটায় তিন নম্বর আপ্‌টাকে যে পাশ করিয়ে দিতে হবে !"

তাঁহার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম—"না না তা কি হয় ? ষ্টেশন ছেড়ে কি আপনাকে যেতে বলতে পারি।"

"খুব পারেন, বিলক্ষণ পারেন ! যেতে কি আর অমন হয় না মনে করেন মশাই। এইত পরশু সকালেই আমাদের সুরুটির মুখুয্যে মশাই মেয়ের বিয়ের একগাদা বাজার করে নিয়ে এসে নেমে বললেন—"মাষ্টার, বাড়ীর ছেলে পিলে ত কাউকে দেখছি না হে, দুপুরের ট্রেণেই আসার কথা ছিল বলেই বোধ হয়, আসে নি। এতগুলো জিনিষপত্র নিয়ে কি করি বল ত ?" কি আর বলব। ভাবলাম এখন বেলা সাতটা, আর দুপুরের ট্রেণ বেলা বারোটায়। মাঝে এগারোটায় একটা মাল্‌ গাড়ি

পার করতে হবে, তা স্রুকুটি থেকে একটু টেনে হাঁটলে ফিরে আসাও যায়।"

শরৎ বলিল—"তাহলে গেলেন নাকি ভদ্রলোকের জিনিষ ব'য়ে তাঁর বাড়ি?"

হাত দুইটা নিরুপায় ভঙ্গিতে চিৎ করিয়া ষ্টেশন মাষ্টার মশাই বলিলেন, "না গিয়ে করি কি বলুন। ভদ্রলোকের মাছটা বেলা বারোটা পর্য্যন্ত থাকলে পচে যায়। তা এসে ধরেছিলাম ঠিক মালগাড়িটাকে, তবে একটু দৌড়োতে হয়েছিল বটে!"

শরৎ বলিল—"খাওয়া দাওয়ার পর এই বয়সে আপনি ছুটোছুটি করতে পারেন।"

"খাওয়া দাওয়ার পর?" ষ্টেশন মাষ্টার মশাই একটু অবাক হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলিলাম—"তারা ত খাইয়ে দাইয়েই ছাড়লে?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"রামঃ, মুখুয্যে মশাই আবার খাওয়াবে ···যা কেপ্পন, বলে নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।"

শরৎ অবাক হইয়া বলিল—"এই এতখানি পথ তাদের মাছ ব'য়ে নিয়ে যাবার পর তারা আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে!"

অত্যন্ত সহজ ভাবে মাষ্টার মশাই বলিলেন "তা নয় ত কি!"

ভাবিলাম সুদূর মফঃস্বলে মন্দ এক ষ্টেশন মাষ্টারের দেখা পাওয়া যায় নাই। লোকটি মনে রাখিবার মত।

এই অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির সঙ্গে কেমন যেন হৃদ্যতা হইয়া গিয়াছিল—এমন লোকের সঙ্গে না হইয়া যায় না।

মিছিল

ভাবিতেছিলাম ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট রাত্রের মত একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিলে মন্দ হয় না। এমন সময় মাষ্টার মহাশয় নিজেই সে কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, "কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি। আজকের রাতটার মত আমার ওখানে যদি কাটিয়ে দেন কাল সকালে আমিই পথ দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারি।"

সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে যে রাজি হইলাম একথা বলাই বাহুল্য।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আফিসের একটু ডিউটি আছে সেরে নিতে হবে। একটু অপেক্ষা করুন।"

ডিউটি দেখিলাম মাষ্টার মহাশয়ের অনেক। আমাদের চারখানি টিকিট একটি টিনের বাক্সে রাখিয়া টুপিটি একটি টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিলেন, তাহার পর ষ্টেশনের লাল নীল কাঁচ দেওয়া বাতিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "চলুন।"

শরৎ বলিল, "আপনার ডিউটি হয়ে গেল মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আটটার ট্রেণটা পাশ করিয়ে দিলেই ছুটি।"

বলিলাম, "আফিসের ঘরে তালাটালা দেবেন না?"

মাষ্টার মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"না, তালা দেব কেন?"

ষ্টেশনটির পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া তাহাও ঘুচিয়া গেল। বলিলাম—"না এমনি বলছিলাম।"

মাষ্টার মহাশয় আগে আগে বাতি লইয়া যাইতেছিলেন। বলিলেন,

"আর তালা থাকলে ত দেব মশাই। কেষ্টা ব্যাটা কবে সেটা সরিয়ে ফেলেছে জানিও না।"

ষ্টেশন হইতে কিছু দূরেই মাঠের মাঝখানে মাষ্টার মহাশয়ের কোয়ার্টার। ষ্টেশন যেমনই হউক কোয়ার্টার মন্দ নয়। ইটের দু কামরা বাড়ি। পাশে একটি রান্নাঘর। সামনে একটি ইঁদারা।

ষ্টেশনেও যেমন বাড়িতেও তেমনি, মাষ্টার মহাশয়ের তালা কোথাও নাই। বাহির হইতে ঠেলিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল, মাষ্টার মহাশয় ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "যা ভেবেছি তাই, কেষ্টা ব্যাটা উনুনে আগুন টাগুন না দিয়েই পালিয়েছে। এত করে বলি ব্যাটাকে যে দেখ আর সব পারি ওই উনুনে আগুন টাগুনটা কেমন হয় না। ওইটুকু বাপু করে দিস্। তা ফাঁকি দিতে পারলে ব্যাটা আর কিছু চায় না।"

অপরিচিত কেষ্টার নব নব পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। মনিবের দুর্ব্বলতাগুলি সে ভাল করিয়াই চিনিয়া ফেলিয়াছে বোঝা গেল।

মাষ্টার মহাশয় রকের উপর উঠিয়া একটা তোলা উনুন দেখাইয়া বলিলেন—"আপনাদের ভারী কষ্ট পেতে হবে দেখছি। একলা থাকি, আমার যাহোক করে একরকম চলে যায়। কিন্তু আপনাদের নিয়ে এসে এখন কি খেতে দিই বলুন দেখি।"

তাঁহার কাতরতা দেখিয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—"আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আশ্রয় পেয়েছি এই যথেষ্ট। একটা রাত কিছু না খেলে কি আর চলে না।"

বলিলাম বটে, কিন্তু সারাদিনের ট্রেণের ধকলের পর রাত্রে উপবাসের সম্ভাবনায় মন বিশেষ পুলকিত হইয়া উঠিল না। তা ছাড়া আমরা

উপবাস করিয়া না হয় থাকিতে পারি কিন্তু সঙ্গী মেয়ে দুটিকে কেমন করিয়া তা বলিয়া অনাহারে রাখা যায়!

মাষ্টার মহাশয় ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "না না, না খেয়ে থাকবেন কি? তাকি হয়!"

শরৎ বলিল, "সত্য কথাই ত বাপু! না খেয়ে থাকতে টাকাতে পারব না! দিন মাষ্টার মশাই আপনার কয়লা টয়লা কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। আমিই উনুন ধরাচ্ছি।"

মাষ্টার মশাই অসীম সাগরের মাঝে যেন কূল দেখিতে পাইয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "পারেন না কি আপনি, উনুন ধরাতে পারেন?"

তাঁহার প্রশংসমান দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল এত বড় কীর্ত্তি সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব একথা তাঁহার কল্পনায় আসে নাই।

শরতের সম্মানে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "শরৎ পাবে বটে উনুন ধরাতে, কিন্তু যেদিন শরতের উনুন ধরে সেদিন আর রান্নার সময় থাকে না এই যা দোষ।"

আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া শরৎ বাহির হইয়া গেল।

দুটি ঘরের একটিতে মেয়ে দুটিকে বসিতে দিয়া অন্যটিতে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম।

এটি মাষ্টার মহাশয়ের ভাঁড়ার ঘর বলিয়াই মনে হইল। একটা ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর কতকগুলি টিন সাজান। আরেক ধারে মেঝের উপর কিছু আলু ও অন্যান্য তরী তরকারী ছড়ান। ঘরের একদিকে কুটনার

খোসা কতদিন ধরিয়া যে জড় হইয়া আছে বলা যায় না। মাষ্টার মহাশয় আর সেগুলি পরিষ্কার করিবার ফুরসৎ বোধ হয় পান নাই। তক্তপোষের তলায় খানিকটা তেল কবে বোধ হয় পড়িয়াছিল আজও তাহা সাফ করা হয় নাই,—ধুলায় জঞ্জালে মেজেটা কালো হইয়া আছে। মাষ্টার মহাশয়ের গৃহস্থালীর শুধু নয় তাঁহার চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিচয় এই ঘরটি দেখিলেই পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ঘরে বসিয়া থাকিবার পর শরৎ ও মাষ্টার মহাশয়ের আর কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া তাহারা কতদূর কি করিলেন দেখিতে বাহির হইলাম। কিন্তু বাহির হইয়াই যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন।

মাষ্টার মহাশয় উবু হইযা বসিযা চোখ মুখ রাঙাইযা উনানে ফুঁ দিতেছেন, শরৎ উপর হইতে সবেগে উনুনের উপর পাখা নাড়িতেছে। কিন্তু আগুন ধরা দূরে থাক একটু ধোঁযা দিয়াও তাহাদের পরিশ্রম সার্থক করিবার ইচ্ছা উনুনটির আছে বলিযা মনে হইল না।

শরৎ আমাকে দেখিতে পায নাই। বলিল, "আরেকটু তেল ঢেলে দিই ; কি বলেন মাষ্টার মশাই ?"

মাষ্টার মশাই হতাশ ভাবে বলিলেন, "আর আছে কি তেল ?"

বুঝিলাম ইতিমধ্যে কেরোসিন তেল ঢালা সম্বন্ধে শরৎ কোনো প্রকার কৃপণতা করে নাই।

বলিল, "আছে সামান্য একটু।"

মাষ্টার মশাইএর শরতের ক্ষমতায় সম্বন্ধে বিশ্বাস অনেকটা ক্ষয় পাইয়াছে মনে হইল। বলিলেন, "কিন্তু তাতেও যদি না ধরে ?"

শরৎ হয়রান হইয়া গিয়াছিল। রাগের স্বরে বলিল, "তাহলে এ উনুন ভেঙে ফেলাই ভাল !"

তাহাদের কথায় হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সুমধুর হাসির শব্দে চমকিত হইয়া চুপ করিয়া দেখিলাম, মুখের ঘোমটা ঈষৎ সরাইয়া আমাদের আশ্রিতা মেয়ে দুটির একজন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে কাপড় গুঁজিয়া কোনো রকমে হাসি থামাইয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"আপনারা সরুন।"

শরৎ লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মেয়েটি মৃদুস্বরে আবার বলিল, "কেরাসিন তেল আর একটু আছে না বলছিলেন! কই ?"

তাহার সমস্ত কীর্ত্তিই মেয়ে দুটি দেখিয়াছে ও সব কথা শুনিয়া মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিযাছে বুঝিয়া শরতের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা শক্ত। লজ্জায় লাল হইয়া সে কেরোসিন তেলের বোতলটা আগাইয়া দিল।

তাহার পর কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই কাটিল। যে দুরূহ কাজ সমাধা করিতে গিয়া তাঁহাদের অমন নাজেহাল হইতে হইয়াছে ভোজবাজির মত মেয়েটি তাহাই কি করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সমাধা করে মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় তাহাই দেখিতেছিলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম, উনুন ধরাইবার সমস্যার এই সোজা মীমাংসাটা আমাদের কাহারও মাথায় এতক্ষণ আসে নাই কেন ? মেয়ে দুটিকে রক্ষা করিতে আমরা এতই ব্যস্ত ছিলাম যে বিপন্ন অবলা ছাড়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে এ কথা মনেই হয় নাই।

কিন্তু দোষ আমাদের সম্পূর্ণ নয়। এই দুই দিন তাহাদের মুখের

ঘোমটা ছাড়া আর কিছুই দেখিবার সুযোগ তাহারা দেয় নাই। তাহারা নন্দপালের ভাইঝি এই সাধারণ পরিচয়টুকুই পাইয়াছিলাম—তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানি নাই। জানিবার সুযোগও তাহারা দেয় নাই।

বিশেষ করিয়া সেই জন্যই চোখে পড়িল আমাদের সাহায্যে আসিয়া মুখে চোখে কৌতুকের আভাষ যে মেয়েটি এখনও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই, বয়স তাহার নিতান্তই অল্প—শুধু তাই নয় রূপও তাহার অসাধারণ।

ইহার পর উনুন ধরিতে বিলম্ব হইল না।

মাষ্টার মহাশয় উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মীরা না হলে কি এসব হয়! আমরা না হয় পারি না কিন্তু কই কেষ্টা ব্যাটাও ত আধবোতল তেল না ঢেলে ধরাতে কোন দিন পারল না।"

শরৎ বলিল, "আপনার কেষ্টার নাম আর করবেন না মাষ্টার মশাই। এখনও তাকে চোখে দেখিনি কিন্তু আপনার মুখে তার বাণী শুনেই তাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি।"

মাষ্টার মশাই কি বুঝিলেন জানি না কিন্তু কেষ্টার প্রতি পাছে কোন অবিচার আমরা করিয়া ফেলি সেই ভয়েই বোধ হয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না না কেষ্টা লোক ভালো, বুঝেছেন কিনা একটু শুধু খামখেয়ালী। স্থির হয়ে দুদণ্ড এক জায়গায় থাকতে পারে না।"

কেষ্টার প্রতি মাষ্টার মহাশয়ের যেরকম দুর্ব্বলতা আছে তাহাতে আরম্ভ হইলে তাহার কথা হয়ত আর ফুরাইতে চাহিবে না বুঝিয়া কথাটা পাল্টাইয়া দিলাম।

শরৎ জিনিষ পত্র আগাইয়া দিয়া মেয়ে দুটিকে সাহায্য করিবার চেষ্টা

করিতেছিল। বলিলাম, "শরৎকে সময় থাকতে বারণ করুন মাষ্টার মশাই, উনুন ধরাতে গিয়ে একবার কেরাসিন তেলের শ্রাদ্ধ করেছে, তারপর এখনও যদি ওর উৎসাহ না দমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে খাওয়া দাওয়া আজ আর ভাগ্যে কারো নেই।"

মাষ্টার মহাশয় দেখিলাম শরতের উপর একেবারে আস্থা হারাইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ আমার কথার সায় দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না না শরৎবাবু দরকার নেই। ওঁদের একটু কষ্ট হবে বুঝছি, কিন্তু যা পারি না তা করতে গিয়ে ওঁদের কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।"

অগত্যা শরৎকে সাহায্য করার দুশ্চেষ্টা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেই হইল।

মেয়ে দুটি দেখিলাম হাসিতেছে।

সত্যই এই অসুবিধার ভিতর আহারটা যে এত ভাল করিয়া জুটিবে আশা করি নাই।

মেয়ে দুটি নিজেরাই সব ভার লইয়া রান্নার আয়োজন করিতেছিল। মুখে ঈষৎ ঘোমটা থাকিলেও সঙ্কোচ তাহাদের ইতিমধ্যে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরে ঢুকিলে মেয়েদের সব কুণ্ঠা বোধ হয় আপনা হইতেই দূর হয়।

মাষ্টার মহাশয়ের ভাঁড়ার হইতে চাল জুটিল, ডাল মিলিল, তরী তরকারীরও অভাব হইল না। তিনি তথাপি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"আপনাদের ভারী কষ্ট হবে বোধ হয়। নূন তেল আছে কিন্তু আর কোন মশলা পাওয়া যাবে না।" কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা।

মাষ্টার মহাশয়ের আশঙ্কার উত্তরে ছোট মেয়েটি মৃদুস্বরে বলিল—"না মশলা আছে ত!"

মাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, "অ্যা আছে নাকি? কে জানে বাপু আমি ত কোন দিন পাই না।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

খাইবার সময় দেখা গেল শুধু মশলা নয় মাষ্টার মশায়ের ভাঁড়ারের আরো অনেক জিনিষেরই খবর তিনি জানেন না। আমরা ত অবাক হইবই মাষ্টার মহাশয় নিজেই তাঁহার ঐ সামান্ত ভাঁড়ার হইতে এ রকম উপাদেয় ভোজের উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

মেয়ে দুটির নাম ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া ও ব্যবহার দেখিয়া তিনি যে তাহাদের বহু দিনের পরিচিত অত্যন্ত নিকট আত্মীয় নয় একথা বলা কঠিন।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের পাতের কাছে অম্বলের বাটি নামাইয়া দিয়া ছোট মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল। মাষ্টার মশাই তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু এবার ত আমায় ফাঁকি দিলে চলবে না মা কমলা! এ অম্বলের তেঁতুল নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে ছিল।"

কমলা আধ ঘোমটার ভিতর হইতে ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"না, আমরা তেঁতুল কোথায় পাব।"

"তবে কি তোমরা বলতে চাও তেঁতুলও আমার ভাঁড়ারে ছিল, আর কাল সারা সকাল অম্বল খাব বলে আমি কেষ্টাকে তেঁতুল পেড়ে আনবার জন্যে সেধে হয়রান হয়েছি।"

কমলা বলিল, "আপনি কোথায় খুঁজেছিলেন?"

"কেন ভাঁড়ার ঘরে!"

মিছিল

"তেঁতুল আপনার শোবার ঘরে ছিল যে" বলিয়া কমলা চলিয়া গেল। মাষ্টার মশাইএর মুখের ভাব দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। তিনি এবার সত্যিই আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে বসিয়া খানিকটা গল্প হইতেছিল। আহারের আয়োজন ও পরিবেশনের ভিতর দিযা মেয়ে দুইটির সঙ্কোচ অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশযের উপস্থিতিতেই তাহারা বোধ হয বেশী করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। তাহারাও তখন নিকটে আসিয়া বসিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুরে আপনারা যাচ্ছেন কার বাড়ি ?"

এতক্ষণের পর একথা জিজ্ঞাসা করা মাষ্টার মহাশযেরই শোভা পায। কাহার বাড়ি যাইতেছি তাঁহাকে জানাইলাম।

নন্দ পালের নাম শুনিযা মাষ্টার মহাশয যেন একেবারে গলিযা গেলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"বড় ভালো লোক মশাই। গ্রামের এমন হিতৈষী লোক এ অঞ্চলে আর নেই।"

মাষ্টার মহাশযের কথায বিস্মিত হইযা জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম ?"

"যাকে দশজনের একজন বলে, আবার কি রকম ? গাঁযে দু দুটো পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছে, ক্রিয়াকর্ম্মে পাল পার্ব্বণে গাঁয়ের অনাথ আতুরদের দুহাতে সাহায্য করে।"

মাষ্টার মহাশয় নন্দ পালের যে পরিচয় দিলেন তাহাতে সত্যই ভীত হইয়া উঠিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা হলে ক্ষমতাবান লোক বলুন ?"

"ক্ষমতাবান নয় আবার! তেজারতিতে অমন দশ হাজার টাকা খাটছে, জমি জমা পুকুর বাগিচা কত যে তার লেখাজোখা নাই।"

নন্দ পালের কাছে তাহার দুই বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামান্য সম্পত্তির মূল্য যে কেন বেশী এবার বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম মেয়ে দুইটিকে তাহাদের স্নেহময় খুল্লতাতের গৃহে ফিরাইয়া দেওয়াটা তেমন সহজ হইবে না।

পরদিন সকালে মাষ্টার মহাশয় আমাদের পৌছাইয়া দিলেন। পথ সত্যই এমন কিছু জটিল নয়। দিনের বেলা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন রকমে হয়ত নিজেরাই যাইতে পারিতাম তবে রাত্রে হয়ত কিছু অসুবিধা হইতে পারিত।

নন্দ পাল যে গ্রামের ক্ষমতাবান লোক তাহা তাঁহার বাড়ি ঘরের জাঁক-জমক দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে এমন আশ্চর্য্য দেখিব আশা করি নাই। খড়ের ও টিনের ছাউনি দেওয়া গ্রামের মাঝে তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা ইষ্টক গৌরবে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নন্দ পাল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড দুমহলা বাড়ির অন্দর মহলের তুলনায় বাহিরের মহল অনেক বড়। বাঁধান আঙিনা ঘিরিয়া প্রকাণ্ড নাটমন্দির, একধারে শ্রীকৃষ্ণজিউএর মন্দির।

আমরা যে আসিতেছি সে খবর কেমন করিয়া বলা যায় না আমাদের

আগেই নন্দ পালের নিকটে পৌঁছাইয়া গিয়াছে দেখা গেল। বাড়ির কাছ বরাবর না পৌঁছিতেই তুজন কোঁটা চন্দন তিলকে সুশোভিত বৈষ্ণব আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর গুণের চর্চ্চা না করিলেও বিনয়ে তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচেন।

"আমাদের কি সৌভাগ্য। আপনারা কষ্ট করে আমাদের গ্রামে এসেছেন" বলিতে বলিতে তাঁহারা সোজা সরল পথ দেখাইযা আমাদের লইয়া চলিলেন।

এতখানি খাতিব প্রথমেই কেমন একটু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিযা দেখিলাম আমাদের অভ্যর্থনার আযোজন বড় কম হয নাই। স্বযং নন্দ পাল—তাঁহার মাথার টাক, স্থূল তৈল-মসৃণ বপু ও হাতের স্বর্ণকবচ দেখিযাই চিনিযাছিলাম—আমাদের গলবস্ত্র হইযা স্বাগত সম্ভাষণ করিতে আসিলেন।

সামনেই সুবৃহৎ ঘরে ফরাস পাতা হইযাছে। রূপা বাঁধান আলবোলা ও জরীর কাজ করা ভেলভেটের তাকিযা তাহার উপর সাজান। দেখিযা শুনিয়া একটু বিস্মিতই হইতেছিলাম। আমাদের অভ্যর্থনার এমন আয়োজন ইহারা এত অল্প সমযের মধ্যে করিল কি করিযা! এই অজ পাড়াগাঁযে অতিথিদের আবার নিত্যই এমন ব্যবস্থা থাকে এ কথাও যুক্তি-সঙ্গত নয়।

কিন্তু এ সমস্যার অচিরেই মীমাংসা হইযা গেল। গলায কণ্ঠি দেওয়া আমাদের গোঁসাইজিকে চকিতে একটি থামের আড়ালে দেখিযা ফেলিলাম। বুঝিলাম তিনিই আমাদের পূর্ব্বে দেশে আসিযা আমাদের আগমনী সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নন্দ পাল করযোড়ে তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে বাধিত করিবার জন্ত আমাদের ফরাসের উপর আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শরৎ আমার কাণে কাণে বলিল—“ওরে এমন জানলে মেস্‌শুদ্ধ যে এগিয়ে দিতে আসতাম রে! বসবার ব্যবস্থাই যে রকম আহারেরটা তদনুপাতে হইলে নেহাৎ মন্দ হবে না।”

আমি ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেসান দিযা বসিযা বলিলাম—“এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু তেমন ভাল ঠেকছে না!”

শরৎ চটিয়া গিযা বলিল, “তোর সন্দিগ্ধ মন। তোর কিছুতেই উদ্ধার নেই··”

কিন্তু কথা আর তাহার শেষ করিতে হইল না। এত আপ্যায়নের ভিতরে কোথায যে গলদ আছে তাহার আভাষ সেই মুহূর্ত্তেই পাওয়া গেল।

নন্দ পালেব ভাইঝি দুইজন আমাদের সহিত কতদূর আসিয়া এইবার অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। নন্দ পাল তাহাদের ডাকিয়া বলিতেছেন শুনিলাম,—“পাগলী বেটিরা এর মধ্যেই ঘরে ঢুকছিস্ কিরে! বাবুরা কষ্ট করে সঙ্গে করে নিযে এল তাদের পেন্নাম করে যা!”

নন্দ পালের গলার স্বরে স্নেহ ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছে।

মেয়ে দুইটি লজ্জিত হইযা ফিরিল এবং আমাদের কাছে আসিয়া মাষ্টার মশাই ও আমাদের দুইজনকে প্রণাম করিল।

কিন্তু এবারেও তাহাদের ভিতরে যাওয়া হইল না। প্রণাম করিয়া উঠিতেই নন্দ পাল হাসিযা বলিল, “আরে অত ব্যস্ত কেন। বোস্ বোস্ এইখানে বোস্। বাবুদের কাছে সব কথা শুনি। ভেবে ভেবে ত কদিন ধরে সারা হচ্ছি।”

"নন্দ পালের মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নেই, কিন্তু বুকটা আমার কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মোলায়েম কোন শয়তানীর চাল সে যে চালিতেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আর আমার মনে ছিল না।

মাষ্টার মশাই সরল হৃদয় লোক। নন্দ পালের কথায় এক গাল হাসিয়া বলিলেন—"তোমার ভাইঝি দুটি কিন্তু বেশ মেয়ে ভায়া। কাল আমায় যা রান্না করে খাইয়েছে কি আর বলব তোমায় !"

তাহার পর মেয়ে দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কিন্তু কাকার বাড়ী এসে বুড়োকে ভুলে গেলে চলবে না। অরুচি হলেই এখানে এসে পাত পাড়্‌ব আগে থাকতে বলে রাখচি। মেয়ে দুইটি লজ্জিত ভাবে মাথা নীচু করিল।

নন্দ পাল এইবার ফরাশের পাশে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল —"তারপর ব্যাপার কি বলত মাষ্টার ? তোমায় এঁদের সঙ্গে দেখব তাত আশা করিনি।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"ভয় নেই ভাই—ভয় নেই, আজই পাত পাতব না।" নিজের কথায় নিজেই হাসিয়া মাৎ করিয়া মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন—"আমি সঙ্গে না থাকলে কি আর ভাইঝিদের আজ পেতে। ওঁরা ত আর পথ চেনে না।"

নন্দ পাল একটু কাশিয়া মুখে গভীর বেদনার ছায়া আনিয়া বলিল— "কদিন ধরে কি ভাবনায় যে দিন কাটছে কি বলব মাষ্টার—আহার নিদ্রে একরকম ত ত্যাগই করেছি। ভাবি মেয়ে দুটো কখন কোথায় যায় না, যেতে দিইও না। শেষে কালীঘাটে গঙ্গা নাইতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ হল রে বাপু। কদিন ধরে পাত্তাই নেই। আবার গাঁয়ের লোক সব কি রকম জানত মাষ্টার ? একটু খুঁৎ পেলেই হল।"

এবার শরৎ আমার দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিয়া ইসারা করিল। বুঝিলাম সন্দেহ আমার একার হয় নাই।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের জলের মত পরিষ্কার মনে দাগ পড়ে না। তিনি নন্দ পালের কথায় প্যাচের বিন্দুবিসর্গও না বুঝিয়া বলিলেন—"যাই হোক ভায়া পেয়েছ ত এইবার। এখন ত ভাবনা চুকেছে। বেটীদের ভেতরে যেতে বল। তোমারও কদিন ভাল করে খাওযা শোওয়া হয়নি যখন এবার একটু সুস্থ হবার চেষ্টা কর।"

নন্দ পাল ম্লান হাসিয়া বলিল—"না দাদা এখন সুস্থ হই কি করে! সুস্থ হতে কি দেয়। ওই বেটা নচ্ছার গোসাই এসে এমন খবর দিলে যে মাথা একেবারে ঘুরে গেল। থানা পুলিশ করব না নিজে কলকেতা যাব ভেবে কূল পাইনে।"

এত ভনিতায় একটু বিস্মিত হইয়া মাষ্টার বলিলেন—"কি অত বকছ নন্দ? ভাইঝিদের ভাবনায় সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?"

"আর বাকী কি দাদা! আমার অবস্থায় পড়লে তোমারও মাথা খারাপ হ'ত। কি কাণ্ডটি গায়ে বেধেছে তার খোঁজ রাখ?"

মেয়ে দুটিও এতক্ষণ বাদে কোথা হইতে যেন বিপদের আভাষ পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের তথাপি সাড়া নাই। তিনি সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে কি!"

নন্দ পাল মাথায় হাত দিয়া বলিল, "হয়েছে আমার সর্ব্বনাশের যোগাড়। যাদের ভালর জন্যে দিনরাত ভেবে মরি তারাই সুবিধে পেলে গলায় পা তুলে দেয়, জানো মাষ্টার!"

গভীর দার্শনিকতার সহিত মাষ্টার মহাশয় একথায় সায় দিয়া

বলিলেন—"তা মিথ্যে বল নি দাদা—সে জন্তেই কারুর ভালো করতে নেই !"

দুঃখের ভিতরও মাষ্টারের কথায় হাসিয়া ফেলিলাম।

নন্দ পালের ভূমিকা এইবার বোধ হয় শেষ হইয়াছিল ! সহসা আসল কথায় আসিয়া সে বলিল—"ঐ বেটা নচ্ছার গোঁসাই এসে কি গাঁয়ে রটিয়েছে জান মাষ্টার ?"

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু গোঁসাই যাহাই রটাক না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় বলিয়া তিনি মনে করেন ইহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল না।

নন্দ পাল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমি কারু মন্দ কখন করিনি, শ্যামসুন্দর জানেন—আর আমার ঘরেই আগুন দেবার চেষ্টা !"

মাষ্টার চমকাইয়া বলিলেন—"কবে আগুন দিলে ? কোন্ ঘরে ?"

নন্দ পাল মাষ্টারের মূঢ়তায় এবার একটু বিরক্তিই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বলিল—"ঘরে আগুন দিলে যে এব চেযে ভাল ছিল মাষ্টার ! এরা যে তার চেয়ে সর্ব্বনাশ করতে চায়, এরা—আমার বংশে কলঙ্ক দিতে চায়। গোসাইকে সঙ্গে দিযে গঙ্গা নাইতে পাঠিযে দিলাম, গোসাই এসে খবর দিলে, -"তারা আসে নি।"

"আসেনি কিরে—?"

বলে, "আজ্ঞে তাদের খুঁজে পেলাম না !"

রেগে উঠে শুধোলাম—"তোদেব সঙ্গে পাঠালাম, আর তোরা খুঁজে পেলি না কি রকম ?"

তাতে বলে কিনা,—"চোখে চোখে ত সারাক্ষণ রেখেছিলাম, খেলনা কেনবার ছুতোয কোথায যে গেল আর পেলাম না !..."

অনেকক্ষণ ধরিয়াই উদ্বেগ জমা হইতেছিল।

মেয়ে দুইটি এবার সকলের সামনেই আকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া কাকার পা ধরিয়া বলিল—"এ সব কথা যে মিথ্যে কাকাবাবু, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি কাকাবাবু—"

নন্দ পাল তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া বলিল—"আরে পাগলীরা আমি কি তোদের অবিশ্বাস করছি নাকি! আচ্ছা বোকা মেয়ে ত সব!"

আমরা দু'জনে এই অবস্থায় কাঠ হইয়া বসিয়াছিলাম। সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেও আমাদের করিবার কিছুই নাই। নন্দলাল পাকা খেলোয়াড়ের মত সমস্ত আটঘাট বাঁধিয়া মাঙের চাল চালিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় কান্নাকাটি দেখিয়া প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলেও সামলাইয়া লইয়া নন্দ পালের কথায় সায় দিয়া বলিলেন—"বোকা না বোকা! তোদের নামে কে কোথায় কি লাগালে আর তাই সত্যি হয়ে গেল নাকি! যা বেটীরা ভেতরে যা!"

মাষ্টার মহাশয়ের উপর এবার বোধ হয় নন্দ পাল রীতিমত চটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের আশা হইতেছিল এই লোকটার অসামান্য সরলতাতেই যদি নন্দ পালের চাল বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু পালের ঘুঁটি ঠিকই আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গোসাই ও শীর্ণ বিশে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল।

মেয়ে দুটিকে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের যেন আর অবধি নাই।

গোসাই দুই ভাঁটার মত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, এই যে এসে হাজির হয়েছে! আচ্ছা মেয়েত তোরা যা হোক! খেলনা কেনবার নাম করে কোথায় যে সরে পড়লি আর দেখা নেই।"

•মেয়ে দুইটি অসহায় ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু বলিল, "কি বলছ, গোসাই কাকা!"

বিশে গোসাইএর এক ধাপ উপরে যায়। খেঁকাইয়া উঠিয়া সে বলিল —"কি বলছি মানে? নন্দ পালের ভাইঝি বলে কিছু রেখে ঢেকে কথা বলব তা ভেবো না, আমাদের স্পষ্ট কথা। চুপ করে কোথায় সরেছিলে বলত?"

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শরৎ অনেকক্ষণ হইতে রাগে ফুলিতেছিল দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আর সহ্য করিতে না পারিয়া আসন হইতে উঠিয়া সজোরে বিশের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া সে বলিল—"মুখ সামলে কথা ক, শয়তান! বদমায়েসীর আর জায়গা পাস্‌নি।"

বিশে প্রথমটা হকচকাইয়া গিয়াছিল।

নন্দ পালও ব্যাপারটার এ পরিণতি বোধহয় আশা করে নাই। কিন্তু তাহার ধৈর্য্য অসীম। একটু থামিয়া সে গম্ভীর স্বরে বলিল— "বেশ করেছেন মশাই, বেশ করেছেন! আমার বাড়িতে বসে আমায় অপমান!"

তাহার এ চাল প্রথমটা আমাকেও হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। নিজে উঠিয়া বিশেকে সে যখন ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল তখন বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এইবার সন্দেহ হইল এতক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কি সত্যাই ভুল বুঝিয়াছি! মাষ্টার মহাশয়এর কথাটাই কি তাহা হইলে ঠিক!

কিন্তু এ সন্দেহ দোলায় বেশীক্ষণ দুলিতে হইল না। ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও খানিক বাদে বিশু, গোসাই ও আরও

কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আবার হাজির হইল। এবার তাহারা রণ বেশেই আসিয়াছে।

সামান্ত দুইটি অসহায় মেয়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত যে গভীর চক্রান্ত ইহারা করিয়াছে তাহার সে অসাধারণ শয়তানী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

বিশুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া আসিবার পর নন্দ পাল অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ আমাদের কাহিনী শুনিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয ব্যাপার দেখিযা কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছেন—"ছি, ছি এমন মিথ্যে কথাও মানুষ বটায। মায়েদের মুখের দিকে বেটারা চাইলে না।"

নন্দ পালেব ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল আমাদের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ যেন দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একথা ভাবিয়া কি ভুলই যে করিযাছি পরমুহূর্ত্তে বুঝিলাম।

বিশু ও গোঁসাইএর সহিত এবার একটি নূতন লোক আসিয়াছিল। লোকটি বযসে বৃদ্ধ, মাথার চুল ও মুখের দাড়ির একটিও শাদা নাই। পক্ক কেশ ও শ্মশ্রুতে বৃদ্ধকে অত্যন্ত সৌম্য শান্ত প্রকৃতির বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহা যে তাহার কত বড় ছদ্ম বেশ তাহা প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না।

বৃদ্ধকে নন্দ পাল যেরকম অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানের সহিত আসন দিল তাহাতে বুঝিলাম গ্রামে তাহার প্রতিপত্তি আছে।

বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দন্তবিহীন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা বুঝি কলকেতায় ?"

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন—"কালেজে পড়েন বুঝি!"

হাসিয়া বলিলাম—"না!"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করেন তা হলে? চাকরী?"

তাহাও করি না শুনিয়া বৃদ্ধ খানিক বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর আমাদের কথা ছাড়িয়া নন্দ পালকে বলিলেন —"তুমি নাকি বিশুকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছ নন্দ?"

নন্দ পাল বেশ একটু উষ্মা প্রদর্শন করিয়া বলিল—"তাত দিয়েইছি—দেবনা! ও আমার কত বড় অপমান করেছে জান ঠাকুরদা!"

'কি করেছে ভাযা' এই বলিয়া—বৃদ্ধ এইবার আলবোলার নলে মুখ দিলেন।

কিন্তু নন্দ পালকে কিছু বলিতে হইল না। বিশু নিজেই আগাইয়া আসিয়া বলিল—"ন্যায্য কথা বললে অপমান হয়। ওঁর ভাইঝিদের আমরা নিয়ে গেলাম কালীঘাট দেখাতে, আমাদের ফেরার পর আজ দুদিন বাদে ওঁরা কোথা থেকে এলেন জিজ্ঞেস করুন ত।"

শরৎ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—আমি তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলাম। রাগ আমারও কিছু কম হয় নাই কিন্তু বুঝিতেছিলাম ইহাদের কার্য্যের মাঝখানে গভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাগারাগি করিয়া কিছুই করিতে পারিব না।

নন্দ পাল বিশুর কথায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল—"আর এ ভদ্রলোকেরা কি বলছেন জান?"

বৃদ্ধ হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিলেন—"ভদ্রলোকেরা যাই বলুন তোমার ভাইঝিরা বিশুদের সঙ্গে ফিরে আসেনি এটা ত ঠিক ?"

নন্দ পাল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যেন একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"সমর্থ হিঁদুর ঘরের বিধবা, দুদিন বিদেশে বিভুঁয়ে কোথায় ছিল বাপু ?"

নন্দ পাল যেন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল, -"এঁরা ত বলছেন !"

"এঁরা যাই বলুন—তুমি এঁদের চেন,—না বিশু গোসাইকে চেন ?"

নন্দ পাল জবাব দিবার কিছু না পাইযাই বোধ হয় চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"এতকাল গাঁযে বাস করছ বিশু বা গোসাই কখন কোন ছোট কাজ করেছে শুনেছ ?"

"তা শুনিনি !"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত রাগে টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। কত বড় একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের ভিতর আমরা যে আসিয়া পড়িয়াছি—কি নিষ্ঠুরভাবে ইহারা ইহাদের পৈশাচিক অভিনয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যে রচনা করিয়াছে তাহা আর তখন বুঝিতে বাকী নাই। তবু নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বৃদ্ধ নন্দ পালের কথায় নিজের যুক্তির অখণ্ডনীয়তার প্রমাণ পাইয়াই যেন সগর্ব্বে বলিলেন—"তবে কি হিসেবে তুমি বিশু আর গোসাইএর কথা অবিশ্বাস করো। এঁরা কলকেতার ছেলে—হয়ত খুব লেখাপড়া জানা ভালো ছেলে, কিন্তু আমরাত এঁদের চিনিনে বাপু। আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মানুষ আমাদের তুমি কেমন করে বোঝাবে ?"

নন্দ পাল গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়াই বুঝি চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ এবার হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"তুমি গাঁয়ের একজন মাথা—তোমার পয়সা আছে লোকবল আছে—ইচ্ছে করলে তুমি যা খুশী করতে পার। ভাইঝিদের তুমি যদি আদর করে ঘরে তুলে নাও তাহলে তোমায় বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু এই তোমায় বলে রাখছি নন্দ—আমাদের আর এর মধ্যে জড়িও না। এর মধ্যে কেন আমাদের তাহলে আর কোন কাজেই জড়িও না। তোমার ভাই পয়সা আছে পয়সার জোরে সব হয়। কিন্তু আমরা গরীব গুর্ব্বো লোক আমাদের ত সমাজ মেনে চলতে হবে!"

বৃদ্ধ গভীর আত্মবিলোপের সুরে তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া আমাদের একেবারে মুহ্যমান করিয়া চলিয়া গেল।

নন্দ পাল তখনও দুশ্চিন্তা ও বেদনার ভারে মাথা নীচু করিয়া আছে। মেয়ে দুইটি একবার আমাদের সকলের দিকে হতাশভাবে চাহিয়া কাকার পায়ের উপর পড়িয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দোহাই ধর্ম্ম—আমরা যে কোন অপরাধ করিনি কাকা!"

আমাদের দুইজনের সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে দুটির কাতর অসহায় মুখের পানে চাহিয়া এই অন্যায় পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে মাথায় যেন আগুন ধরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম ইহাদের বিস্তৃত নির্ভুল চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত চেষ্টা এখন নিষ্ফল। কাপুরুষ অমানুষের দল স্বার্থের প্রয়োজনে সম্মিলিত হইয়াছে। নিজেদের খর্পরের ভিতর ফেলিয়া আমাদের সমস্ত শক্তি ইহারা কাড়িয়া লইয়াছে।

এ সব ক্ষেত্রে একটা মারামারি বাধাইতে পারিলেও শরতের গায়ের

ঝাল হয়ত খানিকটা যাইত। আমারও যে সে ইচ্ছা হইতেছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে মেয়ে দুটির আরো ক্ষতি ছাড়া লাভ যে কিছুই হইবে না ইহা সেও এখন বুঝিযাছে মনে হইল।

স্থাণুর মত আমরা বসিয়াছিলাম। ইহাদের কুমন্ত্রণার চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কোন পথই আমাদের চোখে পড়িতেছিল না।

হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

মাষ্টার মহাশয়কে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সহসা তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেই নিরীহ সদাশিব ভালোমানুষটির ভিতর এমন রুদ্র মূর্তি যে লুকাইয়া থাকিতে পারে কে জানিত?

মাষ্টার মহাশয় বজ্রনির্ঘোষে হাঁকিলেন—"নন্দ?"

সে স্বরে নন্দ পালের বেদনা অভিনয়ের নেশা এক মুহূর্তে বুঝি ছুটিয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"তুমি এই সব নচ্ছার ছোটলোকদের কথা বিশ্বাস কর নন্দ?"

নন্দ হাঁ, না কিছুই বলিল না।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নয়, অসহায়ের উপর অত্যাচারে তাঁহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি আবার একরকম ধমক দিয়াই বলিলেন—"বল বিশ্বাস কর কি না!"

নন্দ পাল একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"বিশ্বাস না করে কি করি বলুন!"

"কি করি না করির কথা হচ্ছে না! তোমার মন কি বলে, তোমার ধর্ম্ম কি বলে?"

নন্দ পালকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় আরো উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"তুমি ত তাহলে ভালো লোক নও বাপু! তুমি মুখ দেখে মানুষ চেন না! এই নির্দ্দোষ মেয়ে দুটোর নামে এত বড় কলঙ্ক তুমি অনায়াসে চাপাতে চাচ্ছ?"

নন্দ পাল হতাশভাবে হাত দুটো চিৎ করিয়া বলিল—"আমি কি করব বল! সমাজ মেনে ত আমায় চলতে হবে! মেয়ে দুটো দুদিন কলকেতায় কাটিয়ে না এলে ত এত হাঙ্গাম হ'ত না।"

মাষ্টার মহাশয় রাগের চোটে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"তার মানে মেয়ে দুটোকে তুমি ঘরে নেবে না! তুমি অতি পাজী নচ্ছার বদমাস লোক নন্দ! মেয়ে দুটোকে পথে ভাসাবার জন্য তুমিই ষড়যন্ত্র করেছ—এই আমি সকলের সামনে বলে যাচ্ছি! ছি, ছি নিজের অনাথা বিধবা ভাইঝি, তাদের এমন সর্ব্বনাশ করে!"

নন্দ পাল এবার বোধ হয় সময় বুঝিয়া একটু রুখিয়া বলিল—"যা তা পাগলের মত বোলো না মাষ্টার! আমি ঢের সহ্য করেছি।"

নন্দপালের তাঁবেদার লোক সেখানে প্রচুর। তাহারাও তখন রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়এর ভ্রূক্ষেপ নাই। সজোরে মেঝের উপর পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন—"যা তা বলবো না! বটে? এই আমি তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, তুমি জোচ্চোর পাজী শয়তান! মেয়ে দুটোর বিষয়ের লোভে তুমি এই চালটি চেলেছ! কিন্তু তা বলে সহজে পার পাবে ভেবো না নন্দ! মেয়ে দুটোকে তুমি ঘরে ঠাঁই নাই দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাবে ধর্ম্মকে আর আইনকে কি করে তুমি ফাঁকি দাও।"

এই সরল সদাহাস্যময় লোকটির তেজোদৃপ্ত ভঙ্গির সামনে নন্দপাল মনে যাহাই ভাবুক মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

মাষ্টার মহাশয় মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া বলিলেন—"চল মা চল। ও বেটা তোদের কাকা নয় চামার!"

মেয়ে দুটি কিন্তু তবুও একবার কাকার পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল— "কাকা গো আমাদের কি এমনি করে বিদায় করে দেবে?"

নন্দ পালের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশে এইবার আর বাধা ছিল না। পাটা সরাইয়া লইয়া দাঁত খিচাইয়া উঠিয়া সে বলিল—"কেন! আর কাকাকে কেন? কলকেতায় গিয়ে নতুন সব ইয়ার বন্ধু জুটেছে এখন তাদের কাছে যাও।"

শরৎ রুখিয়া উঠিতেছিল কিন্তু তাহার আগেই মাষ্টার মহাশয় বজ্রকণ্ঠে বলিলেন—"মুখ সামলে কথা বলো নন্দ, আমাকে আর ঘাঁটিও না!"

নন্দ এবারও সে মূর্ত্তির সামনে নীরব হইয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় নিজেই মেয়ে দুটির হাত ধরিয়া তুলিয়া এবার বলিলেন, "চল মা চল--ও বেটা কসাইএর কি মায়া দয়া আছে?"

আপাততঃ মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমরাও কোন পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমরাও বাহির হইয়া আসিলাম।

মেয়ে দুটির কিন্তু যাইবার ইচ্ছা দেখা গেল একান্তই নাই। তাহারা বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া কাকার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। এখনও তাহাদের বোধ হয় আশা ছিল যে কাকা তাহাদের ফিরিয়া ডাকিবে।

পথে বাহির হইয়াই মাষ্টার মহাশয়ের অন্য মূর্ত্তি।

হঠাৎ পকেট হইতে পুরাণ রঙচটা একটা ঘড়ি বাহির করিয়া তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওকি মাষ্টার মশাই ?"

তিনি কিন্তু তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।

দূর হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল—"সাড়ে এগারটায় মালগাড়ি পাশ করতে হবে। আপনারা ওদের নিয়ে আসুন।"

*

* *

মাষ্টার মহাশয়ের আশ্রয়েই মেয়ে দুটিকে রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না।

সেই রাত্রেই কেমন করিয়া তাঁহার কোয়ার্টারে যে আগুন লাগিল কে জানে!

টাইলে ছাওয়া পাকা দেওয়ালের বাড়ি, তবু পুড়িয়া ক্ষতি বড় কম হইল না। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আগুনের প্রথম আভাষ পাইয়া কোন রকমে দরজা খুলিয়া আমরা বাহিরে বাহির হইয়া প্রাণে বাঁচিলাম বটে কিন্তু জিনিষপত্র অধিকাংশই নষ্ট হইল। ঘরগুলি বাসোপযোগী আর রহিল না।

সকাল বেলা সদানন্দ ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের চোখেও জল দেখিলাম। মেয়ে দুইটি তখন তাঁহাকে কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইতেছে যে তাহাদের পোড়া কপালের জন্ম তাঁহার এত বড় ক্ষতি হইয়া গেল। কিন্তু তিনি সে কথা শুনিলেন না। তিনি অনবরত বলিতেছেন—"বুড়ো যে তোদের সামান্ত একটু আশ্রয়ও দিতে পারল না মা!"

আমাদের বলিলেন—"এব্যারে কি করবে ভাই !"

রাত্রে নিরুপায হইযা সে কথা আমি ভাবিযা রাখিযাছিলাম। মাষ্টার মহাশয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"আপনি ভাববেন না।"

তাহার পর নগণ্য এই গ্রামের স্বল্প পরিচিত সামান্য এক ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ হইতে বিদায লইবার সময সত্তাই চোখ জলে ভরিযা আসিল।

গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে আমাদের জানালা ধরিযা ছেলে মানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয প্লাটফর্মের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড়াইলেন ! মেযে দুইটি সাশ্রুনেত্রে জানলা হইতে মুখ বাহির করিযা তাঁহার কাছে বিদায লইল।

শরৎ এ সমস্ত দুর্ব্বলতাব ধার ধারে না বলিযা বড়াই করে। কিন্তু দেখিলাম সে উল্টা দিকে কঠিন মুখ ফিরাইযা বসিযা আছে। ওদিকে চাহিবার তাহার সাহস নাই।

এই গ্রাম হইতে মানুষেব অসাধারণ শযতানীর পরিচযেব সঙ্গে এমন একটি লোকেব স্মৃতি বহন করিযা লইযা যাইব কে জানিত।

মাষ্টাব মহাশযেব সঙ্গে জীবনে দেখা হইবে না। আট হাতি ধুতি পরিযা খালি গাযে মাথায টুপি চড়াইযা এখনও হযত তিনি সেই ছোট্ট ষ্টেশনটিতে ট্রেণ চলাচলের সহাযতা করিতেছেন। সে ষ্টেশন হইতে আর কোন ষ্টেশনে বা এ জীবন হইতে আর কোন জীবনে তিনি বদলি হইয়াছেন সে খোঁজও রাখি নাই। কিন্তু তবু মানুষ সম্বন্ধে অনেক দেখিয়া যখন হতাশা আসে তখন তাঁহার কথা স্মরণ করিযা একটু সান্ত্বনা পাই।

মিছিল

সামান্য একজন ষ্টেশন মাষ্টারকে লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি সকলের ভালো না লাগিতে পারে। কিন্তু তাহারা বোধ হয় ভাগ্যবান্। পৃথিবীতে খাঁটি মানুষের সংখ্যা যে কত কম এ তথ্য জানিবার দুর্ভাগ্য তাহাদের হয় নাই।

*

* *

মেয়ে দুইটিকে লইয়া যে কোথায় রাখিয়া আসিলাম সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহাদের পিতৃধন উদ্ধার হয় নাই বটে আজো কিন্তু বিশেষ দুঃখে তাহারা নাই।

কোন একটি গ্রামে আত্মীয়ের মাঝে থাকিয়াও নির্ব্বান্ধব অবস্থায় আশাহীন দৃষ্টি লইয়া একটি সুন্দরী মেয়ে স্বামিহীন শ্বশুরঘর করিতেছে! কি যে তাহার মনের কথা তাহা বিধাতাই জানেন মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একদিন শচীন তাহাদের সংসারে নিজেকে ভার স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়াছিলাম আজ অনায়াসে তাহারই স্কন্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে দুইটি অপরিচিতা মেয়েকে চাপাইয়া দিলাম। তাহার তাহাতে এতটুকু বিরক্তি নাই।

তেমনি আগের মত হাসিয়া এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"এত শুকিয়ে গেছ কেন গো! আমার জন্যে ভেবে ভেবে নাকি?"

জবাব দিলাম, "সে অধিকার দিলে কই!"

হাসিয়া মনু বলিল—"এই যে বেশ কথা ফুটেছে দেখছি! কার আওতায় এমন হল গো। আমার যে ঈর্ষে হচ্ছে।"

তাহার পর একটু থামিয়া মনু আমায় বলিল, "আবার অনাথা অবলা মেয়ে কবে পথে কুড়িয়ে পাবে বল ত ?"

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন বল ত !"

"তাহলে এই হতভাগীর ঘাড়ে তাদের চাপাতে ত আসতে হবে ! —নইলে কি আর তোমাদের দেখা পাব !"

এবার গম্ভীর হইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি সত্যি আর এখান থেকে যাবে না মনু !"

সে মাথা নাড়িল মাত্র। চোখে তাহার যেন কিসের ছায়া।

বিদায়ের সময় কিন্তু আবার হাসি মুখ। বলিল, "শচীন দা আমার জন্যে খুব ভাবে না ?"

ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম—"সেটা বোধ হয় তার অন্যায় ?"

মনু হাসিয়া বলিল—"আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে শচীন দার বড় দুঃখ কেমন ?"

এ কথায় আর কি বলিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

মনু বলিল—"শচীন দাকে একটা কথা বোলো। বোলো যে মানুষের সব গল্প গোল হয়ে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বিধাতার গল্পে লাখো আরম্ভ কিন্তু বড় জোর একটি সম্পূর্ণতা। সব খেই সেখানে মেলে না। শচীনদাকে একবার আসতে বোলো।"

কলিকাতায় ফিরিতে শচীন জিজ্ঞাসা করিল—"বাসন্তীপুরে গেছলি নাকি?"

সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলাম—"মনু তোমায় একবার যেতে বলেছে।"

শচীন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ উৎসাহভরে বলিল, "ওরে তোকে বলতে ভুলেছি। নির্ভীক অফিসের চাকরীটা হয়ে গেছে। আমি তোর হয়েও কদিন কাজ চালিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে তোকে যেতে হবে!"

নির্ভীক অফিসের চাকরীই করিতেছি।

—শেষ—